প্রথম অধ্যায়

বাংলা রাজনৈতিক নাটকের ইতিহাস : উদ্ভব থেকে বিশ শতকের ছয়ের দশক

বাংলা রাজনৈতিক নাটকের ইতিহাস : উদ্ভব থেকে বিশ শতকের ছয়ের দশক

রাজনৈতিক নাটকের স্বরূপ :

বিশ শতক নাট্য-ইতিহাসে একদল নাট্যকারের নাট্যচিন্তার মধ্যে ধরা পড়ে নাটককে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার করার প্রবণতা। তাঁরা মনে করেন নিছক আনন্দ দান করা নাটকের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; বরং নাটক গড়ে উঠবে রাজনীতির পরিসরে। সমকালীন রাজনীতির বিশেষ দিকগুলিকে নাট্য-কাঠামোয় নির্মিত করে তা পরিবেশিত হবে জনগণের সামনে। সমাজ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন ও শিক্ষিত করাই ছিল এই ধারার নাটককারদের উদ্দেশ্য। নাটক সম্পর্কে এরকম চিন্তা পোষণকারী নাটককাররা নাটকের আঙ্গিককে তেমন গুরুত্ব দেননি; বিষয়কেই প্রধান করে তুলেছেন এবং আঙ্গিক হয়েছে বিষয় অনুসারী। এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বিশ শতকের পূর্বে রচিত ও পরিচালিত নাটকে কি রাজনীতি ছিল না? তা কি সমাজ পরিবর্তনে বা সামাজিক শিক্ষা প্রবর্তনে কোনো ভূমিকা রাখত? আউগুস্তো বোয়াল (১৯৩১-২০০৯) বলেছেন, 'The argument about the relation between theatre and politics is as old as theatre and...as politics.'[১] আর তা ছিল বলেই প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবি ও নাটককারদের নির্বাসিত করতে চেয়েছিলেন।[২] নাটক সর্বদা প্রচারের একটি অন্যতম মাধ্যম রূপে কাজ করেছে; নিছক শিল্পচর্চার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। ফরাসি বিপ্লবের সময় নাটকের জনমুখী দিকের কথা রম্যাঁ রলাঁ (১৮৬৬-১৯৪৪) তাঁর 'পিপলস থিয়েটার' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক নাট্য বা নাটক বলতে যা বোঝায় তার জন্ম বিশ শতকের ইউরোপে এবং তা বিকাশ লাভ করে এরউইন পিসকাটর (১৮৯৩-১৯৬৬), বেরটোল্ট ব্রেখটের (১৮৯৮-১৯৫৬) নাট্যচর্চার মধ্যে। নাট্য-ইতিহাসে এই চিন্তা-চেতনার পিছনে অবশ্য কাজ করেছিল মার্কসবাদের প্রচার ও প্রসার। বিশ-শতকের সূচনাতেই একদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহ রূপ এবং অপরদিকে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের (১৯১৭) মাধ্যমে কমিউনিস্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য সমকালীন ও পরবর্তী লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবিত করে। নাটকও তার বাইরে ছিল না। এর পূর্বে নাটকে যে রাজনীতি এসেছে তা

রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলেনি; বদলে ক্ষমতার অলিন্দে থেকেই রাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা তুলে ধরে তার সমাধান চেয়েছিল। কাজেই, রাজনীতির প্রসঙ্গ এলেও সেগুলি মূলত ছিল সমাজ-সচেতন নাটক। আধুনিক রাজনৈতিক নাটক রাষ্ট্রের শোষণ, নিপীড়নের চিত্র আঁকে, প্রশ্ন করে, শোষিতদের আর্থ-সামাজিক দিক তুলে ধরে তাদের রাজনীতি সচেতন করে, শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিদ্বন্দ্বের কথা বলে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দেয়। নাটক হয়ে ওঠে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার।

'পলিটিক্যাল থিয়েটার' কথাটির বাংলা পরিভাষা 'রাজনৈতিক থিয়েটার' এবং সেই থিয়েটারে যে নাটক অভিনীত হবে তাই 'রাজনৈতিক নাটক'। 'রাজনৈতিক নাটক'-এর বিশ্লেষণের পূর্বে দেখতে হবে 'রাজনীতি' বলতে কী বোঝায়। রাজনীতি নির্ভর করে সমাজচিত্র ও সংস্কৃতির উপর। আর সমাজ ও সংস্কৃতি যেহেতু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম থেকেছে সেহেতু রাজনীতির ধারণাও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ঐতিহাসিক প্রক্ষাপটে প্রতিটা যুগের ধর্ম আলাদা, তাই রাজনীতির সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্যও প্রতিটা যুগে ভিন্ন। 'রাজনৈতিক নাটক' কথাটা যেহেতু বিশ শতকের ফসল সেহেতু 'রাজনীতি'-র আধুনিক অর্থের দিক থেকেই এই ধারার নাটকের বিচার করা কাম্য।

বর্তমানে রাজনীতি বলতে সরকার বা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পদ্ধতি বা আন্দোলনকে যেমন বোঝানো হয়, তেমনি সরকারে জড়িত ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্র বা সরকার পরিচালনায় যে সকল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কিংবা সরকারের বাইরে থেকে রাজনৈতিক দলের পক্ষাবলম্বনে কিংবা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের জন্য সরকারের প্রতি যে চাপ প্রয়োগ করে তাকেও রাজনীতি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। রাজনীতি বহু সময়ে দেশে সমাজবিপ্লব সংগঠিত করতে চায়, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালায়, নিজ দল বা মতাদর্শের পক্ষে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করে। রাজনীতি হল একটা লড়াই। প্রতিকূল একটা শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে পরাভূত করাই হল তার লক্ষ্য। রাজনীতি হল ক্রমান্বয়িক গতিশীলতা, প্রতিকূলকে পরাজিত করেও তাকে এগিয়ে যেতে হয়। রাজনীতি হল একটা বিজ্ঞান, যার একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি আছে।

মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শ্রেণিগত, ব্যক্তিগত সব কর্মকাণ্ডকে রাজনীতি বোঝায়। রাজনীতির প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্যই হল কর্তৃত্ব বা

ক্ষমতা। রাজনৈতিক দল হল সেই লক্ষ্যের বা অভিযানের সামগ্রিক বাহিনী। সেই লক্ষ্য অর্জনে সব থেকে বেশি যেটা প্রয়োজন সেটা হল নিজ মতাদর্শের প্রতি মানুষের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করা। রাজনীতির এই যে ব্যাপকতা, এখান থেকেই রাজনৈতিক নাট্য বা নাটকের সংজ্ঞা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। সমস্ত নাটক কি রাজনৈতিক?—এই প্রশ্নেরও বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করা যায়। কোনও নাটককে তখনই রাজনৈতিক বলা যায়, যখন সেই নাট্য-প্রচেষ্টা রাষ্ট্র এবং সরকার ও রাজনীতি নিয়ে কথা বলে, ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, প্রয়োজন মতো কোনও না কোনও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত হয়। রাজনীতি প্রচার না করে রাজনৈতিক নাটক হতে পারে না। এই প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক নাটক কোনও একটি ভাবনা বা মতাদর্শকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থান থেকে হয় সমর্থন, নয় আক্রমণ করে। এই ধরনের রাজনৈতিক নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে তার প্রযোজনাগত সকল উপাদান যেমন আলো, সঙ্গীত, পোশাক, মঞ্চ প্রভৃতি সবকিছুই কোনও একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যকে প্রকাশ করতে চায়।

বর্তমান রাজনীতির অভিমুখ জনগণকে ক্ষমতা আধার করা, শোষণমুক্ত সমাজ নির্মাণ করা, সমাজের অসাম্য ব্যবস্থার উৎপাটন করা, গণতন্ত্র তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং রাজনৈতিক নাটকের বিষয় হবে সেরকমই। কখনও পক্ষে, কখনও বিপক্ষে। সামাজিক শিক্ষার প্রচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই রাজনৈতিক নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক নাটকের বিষয় হবে সমাজের অধিক সংখ্যক জনগণ। যারা সামাজিক ভাবে শোষিত ও অবদমিত। তাদের হয়ে কথা বলা, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, রাষ্ট্রের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। এই ধারার নাটক রচনার প্রবণতা লক্ষ করা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানুষের কাছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী অর্থলোলুপ জনবিরোধী রূপকে যেমন তুলে ধরে, অন্যদিকে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব ও তৎপরবর্তী শ্রমিক শ্রেণির নিজস্ব রাষ্ট্র-ব্যবস্থা মানুষের মনে আশার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা যোগায়। নব গঠিত সোভিয়েত রাশিয়া যার আদর্শ। যে আদর্শের মূল ভিত্তি ছিল মার্কসবাদ। সেই আদর্শের প্রভাবে গঠিত হয় রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতি। যার একটি বড় অংশ রাজনৈতিক নাটক।

রম্যাঁ রলাঁর 'পিপলস থিয়েটার'-এর ধারণা :

রম্যাঁ রলাঁ নাটককে জনমুখী করে তোলার পক্ষে কথা বলেন তাঁর 'পিপলস থিয়েটার' গ্রন্থে। ফরাসি পত্রিকা 'রেভ্যু দ'আর্ত দ্রামাতিক'-এ ১৯০০ থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে ফরাসি ভাষায় রম্যাঁ রলাঁর থিয়েটার সম্পর্কিত কতগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যা ১৯০৩ সালে একত্রিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশ পায়। তবে মূলত ১৯৩৮ সালের পর থেকেই বিশ্বের প্রগতিশীল নাট্যচর্চায় এই বই আলোড়ন সৃষ্টি করে।[৩] সে যাই হোক, আমাদের এখানে আলোচনার বিষয় 'পিপলস থিয়েটার' সম্বন্ধে রম্যাঁ রলাঁর বক্তব্য। তিনি এখানে ঘোষণা করেন—

> 'আদর্শহীন থিয়েটারে আমি বিশ্বাস করি না। যদি আমার মনে হয় আমাদের থিয়েটারের দর্শক বুর্জোয়াদের মতোই আর একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হবে, যদি মনে হয় প্রমোদ-চর্চায় তাঁরা যথেষ্ট অশ্লীল, যদি মনে হয় নৈতিক দিক থেকে তাঁরা ভণ্ড এবং প্রকৃত বুর্জোয়াদের মতোই নির্বোধ ও মোটা চামড়ার লোক, তাহলে নিশ্চয়ই সেই জনগণকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করে আমি আমার মস্তিষ্ককে বিব্রত করব না।'[৪]

'পিপলস থিয়েটার'-এ জনগণকেই রম্যাঁ রলাঁ প্রধান গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন—'আমাদের থিয়েটার হবে জনগণের জন্য এক প্রকাণ্ড, দীর্ঘস্থায়ী, ঐতিহাসিক শিল্প। আমাদের থিয়েটার হবে জনগণের দ্বারা; জনগণের হাতেই সৃষ্টি।'[৫] পিপলস থিয়েটারের ভিত্তি হিসেবে তিনি প্রাথমিক তিনটি শর্তের কথা বলেছেন—আনন্দ, শক্তি বা উৎসাহ এবং বুদ্ধিদীপ্ততা।[৬] প্রতিদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর শ্রমজীবী মানুষের কাছে থিয়েটার হবে আনন্দের উৎস। যা তাদের দৈহিক, মানসিক প্রফুল্লতা ও বিশ্রাম দেবে। নাটককারকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দুঃখ, বিষাদ বা বিরক্তি যেন তা তৈরি না করে। কারণ এই ধরনের শিল্প কখনও কখনও জনগণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করে থাকে। শ্রমজীবী মানুষ প্রতিনিয়ত সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে নির্যাতিত। সেজন্য সেই সব জনগণকে নিজেদের দুঃখময় অবস্থান থেকে সরাতে আর একটি দুঃখময় অবস্থানের কথা শোনানো যথাযথ নয়।[৭] দ্বিতীয় শর্ত হল থিয়েটারকে হতে হবে শক্তির উৎস। আনন্দ বা বিনোদন পরিবেশনের সঙ্গে নাটককারকে এটাও মনে রাখতে হবে

জনগণ যেন তা দেখে পরের দিন আরও ভালোভাবে কাজ করার মানসিক শক্তি পায়। 'আশাব্যঞ্জক নয় বা হতাশাজনক, এমন সবকিছুকে এড়িয়ে চলাটাও একটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। এক্ষেত্রে এমন একটা প্রতিষেধক চাই যা আত্মাকে মহিমান্বিত করবে, তাকে সমর্থন করবে, সবকিছুকে প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে।'[৮] নাটককার হয়ে উঠবে জনগণের প্রতিদিনের জীবন-যাত্রার সঙ্গী। যার কর্তব্য হবে জনগণকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া। নাটককার জনগণকে তার যাত্রা পথে শিখিয়ে দেবে নানা অভিজ্ঞতা, চিনিয়ে দেবে নানা পরিস্থিতি। এখানেই কাজ করে পিপলস থিয়েটারের তৃতীয় শর্ত বুদ্ধিদীপ্ততা। রম্যাঁ রলাঁ মনে করেন মানুষের বুদ্ধি আছে ক্ষুরধার, কিন্তু তা ছায়াছন্ন। সেই ছায়াছন্নতাকে কাটিয়ে দেবে থিয়েটারের জ্ঞানের আলো।[৯] সেই সঙ্গে থিয়েটারে নীতিবাক্য ছড়ানো ও সস্তা বিনোদনের আমদানি করাকে কঠোরভাবে বর্জন করার কথাও তিনি বলেছেন।[১০]

ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯-১৭৯৯) কিছু আগে থেকেই নাটককে জনমুখী করে তোলার একটা প্রয়াস তৎকালীন কিছু নাট্য-ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ভালোভাবেই দানা বেঁধেছিল। লুই সেবাস্তিয়াঁ মার্সিয়া তাঁর 'নুভেল এসেই সুর ল'আর্ত দ্রামাতিক' (১৭৭৩) ও 'নুভেল একজামেন দ্য লা ত্রাজেদি ফ্রাঁসাই' লেখাগুলিতে এমন এক গণনাট্য প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছেন যার প্রেরণা-উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সবই হবে জনগণ। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'থিয়েটার হল মানবিক যুক্তিবোধকে শক্তিশালী করার এবং গোটা জাতিকে আলোকিত করার সব থেকে ক্ষমতাসম্পন্ন এবং প্রত্যক্ষ মাধ্যম বা পদ্ধতি।'[১১] রুশোও (১৭১২-১৭৭৮) চাইতেন থিয়েটারের মাধ্যমে গণ-উৎসব আয়োজন করে শিক্ষাকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। বিপ্লবের পর সেই গণ-উৎসব আয়োজিত হয়। যে উৎসবের প্রধান লক্ষ্য ছিল, বিপ্লবের মূল ঘটনা ও দিকগুলিকে তুলে ধরে একটি নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি করা। ৩১ জানুয়ারি, ১৭৯৪ 'কমিটি অব জেনারেল সিওরিটি' প্যারির বিভিন্ন থিয়েটার পরিচালকদের কাছে সুপারিশ পাঠান—

> 'তাঁরা তাঁদের থিয়েটারগুলিকে রীতিনীতি ও শোভনতার শিক্ষায়তন হিসেবে গড়ে তুলবেন...তাঁদের দেশাত্মবোধক নাটকের পাশাপাশি...অন্যান্য নাটকও প্রযোজনা করবেন যেখানে ব্যক্তি-গরিমাকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরা হবে।'[১২]

বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে লেনিন ও মাও সেতুঙ-এর বক্তব্য :

ফরাসি বিপ্লব ছিল মূলত বুর্জোয়া বিপ্লব। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামো ভেঙে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই ছিল সেই বিপ্লবের লক্ষ্য। তাই নাটকও হয়েছিল অনুরূপ আদর্শের। আসলে রেনেশাঁসের পর থেকেই বণিকতন্ত্রের আধিপত্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। নাটক ও নাট্যশালাগুলিতে অভিজাত সমাজের পাশাপাশি বণিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ফরাসি বিপ্লবের পর যখন সমগ্র সমাজ তাদের আয়ত্তাধীন হয় তখন শিল্প-সাহিত্য-নাটককে তারা নিজেদের বীক্ষায় সাজায়। সেখানে এল দেশাত্মবোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তি-গরিমার উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি ইত্যাদি। এই বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় শোষিত হয়েছিল শ্রমিক সমাজ। যারা প্রতি যুগে সংখ্যাগুরু থেকেছে, কিন্তু শোষণমুক্ত থাকতে পারেনি। রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের (১৯১৭) পর প্রতিষ্ঠা পায় শ্রমিক শ্রেণির শাসনব্যবস্থা, শ্রমিকরাষ্ট্র। তখন প্রয়োজন পড়ে বিপ্লবী সংস্কৃতি, শ্রমিক শ্রেণির সংস্কৃতি, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির রূপায়ণ। সেই ধারাকে অবলম্বন করেই তৈরি হল নাটকের নতুন রূপ। আজকের রাজনৈতিক নাটকের হৃৎ-স্পন্দন সেখানেই শোনা গিয়েছিল জোরালো ভাবে। বিপ্লবী সাহিত্য কেমন হবে সে প্রসঙ্গে ভি. আই. লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) তাঁর 'Party Organisation and Party Literature'-এ বলেন—

> 'It is not simply that, for the socialist proletariat, literature cannot be a means of enriching individuals or groups: it cannot, in fact, be an individual undertaking, independent of common cause of the proletariat. Down with non-partisan writers! Down with literary superman! Literature must become part of common cause of proletariat, "a cog and a screw" of one single great Social-Democratic mechanism set in motion by their entire politically-conscious vanguard of the entire working class.'[১৩]

এবং এই সাহিত্য কাদের জন্য লেখা হবে, সে প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ‘It will be a free literature, because it will serve, not satiated heroine, not the bored “upper ten thousand” suffering from fatty degeneration, but the millions and tens of millions of working people—the flower of the country, its strength and its future. It will be a free literature, enriching the last word in the revolutionary thought of mankind with the experience and living work of the socialist proletariat, bringing about permanent interaction between the experience of the past (scientific socialism, the completion of the development of socialism from the primitive, utopian forms) and the experience of the present (the present struggle of the worker comrades).’[১৪]

পরবর্তী সময়ে মাও সেতুঙ (১৮৯৩-১৯৭৬) ‘ইয়েনান ভাষণ’ (মে, ১৯৪২)-এ সাহিত্য ও শিল্পের রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন।

মাও সেতুঙ জাতীয় বিপ্লবের ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বাহিনীকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ সাংস্কৃতিক বাহিনী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও শিক্ষিত করতে, শত্রুকে চিনিয়ে দিতে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। কিন্তু বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্প সঠিক পথে বিকাশলাভ করার ক্ষেত্রে লেখক ও শিল্পীরা কতগুলি সমস্যার সম্মুখীন হয়। এক্ষেত্রে মাও সেতুঙ পাঁচটি সমস্যা ও তাদের সমাধানের কথা বলেছেন।

প্রথম সমস্যা হল শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা। বিপ্লবী শিল্পী-সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে সর্বহারাশ্রেণি ও জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ বিপ্লবী পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি, মেজাজ ও কর্মনীতিতে অবিচল থাকতে হবে।[১৫]

দ্বিতীয় সমস্যা হয়ে থাকে মনোভাবের সমস্যা। কারও প্রশংসা করতে হবে, নাকি তার স্বরূপ উদঘাটন করতে হবে? এটিই হচ্ছে মনোভাবের প্রশ্ন। এর পিছনে কাজ করে শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গি। বিপ্লবের সময় তিন ধরনের লোক সমাজে থাকে—বিপ্লবের শত্রু, যুক্তফ্রন্টে

থাকা মিত্র এবং জনসাধারণ ও তাদের অগ্রগামী বাহিনী।[১৬] এই তিন ধরনের লোকের প্রতি বিপ্লবী শিল্পী-সাহিত্যিকদের মনোভাব হবে বিভিন্ন। শত্রুদের ক্ষেত্রে তাদের নিষ্ঠুরতা ও কপটতাকে উদঘাটিত করা এবং তাদের পরাজয়ের অনিবার্যতাকে দেখিয়ে দেওয়া; যাতে জনগণের যুদ্ধ করার মনোবল দৃঢ় হয়। যুক্তফ্রন্টে থাকা মিত্রদের প্রতি মনোভাব হবে ঐক্যের ও সমালোচনার। প্রতিরোধ যুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণকে সমর্থন এবং সাফল্যকে প্রশংসা করা হবে; কিন্তু যদি প্রতিরোধ যুদ্ধে তারা সক্রিয় না হয় তাহলে সেখানে মনোভাব হবে সমালোচনা মুখর। জনসাধারণের সংগ্রামকে প্রশংসা করা বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্যের অবশ্যই উচিত; কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের ত্রুটি তুলে ধরে সমাধানের রাস্তা দেখানোও কর্তব্য। দীর্ঘদিন ধরে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় থাকার ফলে সর্বহারা জনসাধারণের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যাদের চিন্তাধারা বুর্জোয়াশ্রেণির। যা সংগ্রামের ক্ষেত্রে বোঝাস্বরূপ। সুতরাং তারা যাতে সেই সব চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসতে পারে সেজন্য তাদের শিক্ষিত করা এবং পাশে থাকা বিপ্লবী শিল্পী-সাহিত্যিকদের অন্যতম কর্তব্য।

তৃতীয় সমস্যা হচ্ছে এই ধরনের শিল্প সাহিত্যের পাঠক-শ্রোতা-দর্শক কারা হবে? মাও সেতুঙ উত্তরে বলেছেন শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, সৈনিক, বিপ্লবী ক্যাডারদের কথা।[১৭] এরা অক্ষরজ্ঞান লাভ করলেই বই বা খবরের কাগজ পড়তে চায়; আর যাদের অক্ষরজ্ঞান থাকে না তারাও নাটক ও অপেরা বা চিত্রশিল্প দেখতে চায়, গান করতে বা শুনতে চায়। বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি হবে তাদের জন্যই। এখানেই দেখা দেয় চতুর্থ সমস্যা অর্থাৎ লেখক ও শিল্পীদের কাজের সমস্যা। কিছু সৃষ্টি করার আগে লেখক ও শিল্পীদের প্রাথমিক কাজ হল যাদের জন্য সৃষ্টি সেই জনগণকে ভালোভাবে জানা ও বোঝা, তাদের ভাষাকে রপ্ত করে 'গণ-শৈলী' তৈরি করা—যাতে লেখক ও শিল্পীদের আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তাভাবনার সঙ্গে জনগণ একাত্ম হতে পারে।[১৮]

এই চারটি সমস্যা সমাধানের পথকে সুগম করে লেখক ও শিল্পীদের পড়াশোনা। এটিই হল পঞ্চম সমস্যা যে, তাদের পড়াশোনা কেমন হবে! এখানে মাও সেতুঙ বিশেষ জোর দিয়েছেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে। কারণ লেখক ও শিল্পীদের সমাজকে অধ্যয়ন করতে হবে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রত্যেক শ্রেণির অবস্থা, তাদের চেহারা ও মনস্তত্ত্ব পর্যালোচনা করতে হবে।[১৯]

মাও সেতুঙ শ্রেণি-ঊর্ধ্বে শিল্প-সাহিত্যের বিরোধিতা করেছেন; কারণ এক অর্থে তা বুর্জোয়া শ্রেণির পতাকা বহন করে[২০] এবং তা জনগণের সাহিত্য হতে পারে না। তিনি সাহিত্য-শিল্পকে জনগণের সেবায় নিয়োজিত করতে চেয়েছেন। এখন কীভাবে সেবা করবে? এই প্রশ্নের উত্তরে মাও সেতুঙ উন্নতমানের শিল্প ও জনপ্রিয় শিল্পের কথা বলেছেন। তবে তার লক্ষ্য হবে কাদের জন্য লেখা হচ্ছে সেদিকে। বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্যকে জনপ্রিয় করতে হবে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের মধ্যে এবং মানোন্নয়ন ঘটাতে হবে এই লক্ষ্যে যাতে জনগণ নিজেদের বর্তমান স্তর থেকে অগ্রসর হতে পারে। সামন্তবাদী জমিদার শ্রেণি বা বুর্জোয়া শ্রেণি বা পাতি বুর্জোয়া শ্রেণিদের মধ্যে যে ধরনের শিল্প-সাহিত্য জনপ্রিয় সেই ধরনকে বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্য গ্রহণ করবে না; বরং শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের কাছে যা প্রয়োজনীয় এবং যা তারা সহজে অনুভব করতে পারে তাই জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। মানোন্নয়ন করতে হবে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের ভিত্তি থেকে। অর্থাৎ তারা এবং সর্বহারা শ্রেণি যে পথে অগ্রসর হচ্ছে সেই পথেই মানোন্নয়ন ঘটাতে হবে। তাদের বর্তমান স্তর থেকে আরম্ভ করলেই জনপ্রিয় ও মানোন্নয়নের মধ্যেকার সম্পর্ক আয়ত্ত করা যাবে।[২১]

পিসকাটরের 'প্রলেতারিয়েত থিয়েটার'-এ রাজনীতি চিন্তা :

রাজনৈতিক নাট্য-আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর এবং দার্শনিক তত্ত্ব নির্মাণে যে দুজনের নাম বিশেষভাবে করতে হয় তাঁরা হলেন এরউইন পিসকাটর ও বেরটোল্ট ব্রেখট। এঁরা দুজনেই ছিলেন জার্মানের। দুই বিশ্বযুদ্ধের সময়পর্বে এঁদের নাট্যজীবন বিকাশলাভ করেছে। এঁদের মধ্যে পিসকাটরকে আধুনিক রাজনৈতিক নাট্যশালার জনক বলা হয়ে থাকে। তাঁর 'The Political Theatre' গ্রন্থে নিজের নাট্যজীবনের নানা অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক থিয়েটার সম্পর্কে নিজ ধারণা স্পষ্ট করেছেন। ব্রেখটের মতো পিসকাটর নিজে কোনও নাটক রচনা করেননি, তিনি ছিলেন পরিচালক মাত্র। অল্প বয়েস থেকেই নাট্যানুরাগী এই ব্যক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণদামামায় দেখেছেন কীভাবে একটা জাতি উন্মাদনার জোয়ারে ভেসেছে। ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে নিজেকেও যেতে হয়েছিল যুদ্ধে শামিল হতে।[২২] সেখানে সৈনিকদের মনোরঞ্জনের জন্য যোগ দিয়েছিলেন 'ফ্রন্টলাইন

থিয়েটার'-এ। যেখানে শিল্প ছিল নিছক একটা বিনোদনের সামগ্রী। এখানে তিনি দেখেছেন কীভাবে যুদ্ধে উন্মত্ত জনগণ জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে শিল্পকে কতখানি কদর্য ও অশোভন করে তোলে।[২৩]

যুদ্ধের এই অভিজ্ঞতায় তিনি অনুভব করেছেন শিল্পের সামাজিক দায়িত্ব। শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে আর জীবনকে নয়, বরং জীবনের মধ্যে শিল্প-সাহিত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন।[২৪] সচেতন হয়েছেন রাজনীতি সম্পর্কে। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব তাঁর চেতনায় তীব্র প্রভাব ফেলে। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন—

> 'Art and politics were two separate roads which ran parallel for a long time, in fact, until the year 1919. My feelings had, of course, changed. Art for its own sake could no longer satisfy me. On the other hand, I could see no meeting point for these two roads, at which a new concept of art would emerge, activistic, combative, political. The change in my feelings had still to be encompassed by a new theory which would clearly formulate everything which I now dimly perceived. For me the Revolution produced that new theory.'[২৫]

পিসকাটরের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল, শিল্পকে শ্রেণি-সংগ্রামের হাতিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে। তিনি এই ধারণা পোষণ করতেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনই শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেজন্যই শিল্পকে হয়ে উঠতে হবে 'প্রপাগান্ডিস্ট' ও 'পেডাগগিক্যাল'।[২৬] সেই লক্ষ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'প্রলেতারিয়েত থিয়েটার' (২০ অক্টোবর, ১৯২৩)। যার প্রচারপত্রে লেখা ছিল—

> 'to support a Proletarian theatre with a view to making it a propaganda platform of the revolutionary workers of Greater Berlin.'[২৭]

এই থিয়েটারের কতগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা পিসকাটর তুলে ধরেছেন।–

১. প্রলেতারিয়েত থিয়েটারে পরিচালককে অবশ্যই অভিব্যক্তির সরলতা, কাঠামোর স্পষ্টতা এবং শ্রমিকশ্রেণির দর্শকের অনুভূতিতে স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শ্রেণি-সংগ্রামের ধারণাকে দর্শকের চেতনায় রোপন করার কাজে জোর দিতে হবে।[২৮]

২. প্রলেতারিয়েত থিয়েটার সর্বদা বিপ্লবী আন্দোলনকে পরিবেশন করতে চায়। বিপ্লবী কর্মীদের প্রতি তার একটি কর্তব্য রয়েছে। বিপ্লবী কর্মীরাই নিশ্চিত করবে এই থিয়েটারের সাংস্কৃতিক ও 'প্রপাগান্ডাস্টিক' লক্ষ্য কী হবে।[২৯]

৩. অভিনেতা, লেখক এবং পরিচালকের দ্বারা ব্যবহৃত শৈলী অবশ্যই বাস্তবসম্মত হবে। যা বলা হবে তার সবকিছুকেই হতে হবে পরীক্ষা-নিরীক্ষাহীন, প্রকাশহীন, শিথিল, সরল, অগোপনীয় এবং বিপ্লবের লক্ষ্যের অধীনস্ত। এই কারণে বুর্জোয়া শিল্পীদের নৈরাজ্যবাদী, ব্যক্তিবাদী, ব্যক্তিগত চাহিদা থেকে উদ্ভূত সমস্ত 'নিও রোমান্টিক', 'এক্সপ্রেশনিস্ট' এবং অনুরূপ শৈলী ও সমস্যাগুলিকে শুরুতেই বাদ দিতে হবে।[৩০]

৪. প্রলেতারিয়েত থিয়েটারকে দুটি মৌলিক শর্ত উত্থাপন করতে হবে—ক. পুঁজিবাদী ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এবং সাম্যের একটি ভিত্তি তৈরি করতে হবে। খ. জনগণের যে অংশ রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধান্তহীন অথবা উদাসীন তাদের উপর শিক্ষামূলক ও প্রচার মূলক প্রভাব ফেলতে হবে।[৩১]

ব্রেখটের রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা :

আধুনিক রাজনৈতিক থিয়েটারের যাত্রা এরউইন পিসকাটর-এর হাত ধরে শুরু হলেও তাকে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন বেরটোল্ট ব্রেখট। রাজনৈতিক থিয়েটারের যথাযথ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি রচনা করেন 'A Short Organum for the Theatre' বইটি। এখানেই তাঁর নাট্যচিন্তার সার্বিক দিক লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখান থেকেই খুঁজে নেওয়া যেতে পারে তাঁর নাট্যচিন্তায় রাজনৈতিক থিয়েটার বা নাটকের স্বরূপটি কেমন।

ব্রেখট তাঁর নাট্যচিন্তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমেই স্পষ্ট করেছেন—'বিনোদন' (আনন্দ) সৃষ্টি করাই থিয়েটারের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এই বিনোদনের চেহারা সব যুগে একরকম থাকেনি, বিভিন্ন কালে তার রকমফের ঘটেছে। সেটা নির্ভর করেছে মানুষ যে সমাজ-ব্যবস্থায় জীবনযাপন করে তার উপর। উদাহরণ স্বরূপ তিনি জানিয়েছেন যেমন টাইর‍্যান্ট শাসিত হেলেনিয় সার্কাসের জনগণের জন্য বিনোদন চতুর্দশ লুইয়ের সামন্ততান্ত্রিক দরবারের বিনোদন থেকে আলাদা ছিল।[৩২] সেজন্যই প্রত্যেকটা যুগের থিয়েটারের উপস্থাপন রীতিতে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সেই ভিন্নতার ধাঁচ অনুযায়ী চরিত্রগুলোর যথোচিত সামঞ্জস্য বিধান এবং সমীচীন দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাসঙ্গতি (কাহিনি) স্থাপন করা একান্তই প্রয়োজন। এখন বর্তমান যুগ পূর্ববর্তী যুগের থেকে আলাদা। কিন্তু ব্রেখট বলেন এই যুগের যথোচিত থিয়েটারের নির্মাণ এখনও হয়ে ওঠেনি। থিয়েটারের বিনোদনের রীতিটা সাবেককালেরই রয়ে গেছে। ফলে তার মর্মগ্রহণ করতে দর্শকদের 'সমানুভূতি' (এমপ্যাথি)-এর প্রয়োজন পড়ে। এখানেই ব্রেখট বর্তমান যুগের থিয়েটার নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> 'For when we look about us for an entertainment whose impact is immediate, for a comprehensive and penetrating pleasure such as our theatre could give us by representations of men's life together, we have to think of ourselves as children of a scientific age. Our life as human beings in society-i.e., our life-is determined by the sciences to a quite new extent.'[৩৩]

ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে ইউরোপের রেনেসাঁসের পর থেকে বণিক শ্রেণি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। সে সময়েই বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার সমাজ-জীবনকে ক্রমশ বদলে দেয়। সেই বিজ্ঞান এসে পৌঁছায় বণিক শ্রেণির হাতে। তারা বিজ্ঞানকে কাজে লাগায় নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনে। ফলে বিজ্ঞানের দৌলতে ব্যবসা-বাণিজ্য ফুলে-ফেঁপে উঠে, ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের সর্বত্র। ব্যবসা-বাণিজ্যের এই অগ্রগতিতে বণিক শ্রেণি জড়ালো পারস্পরিক প্রতিযোগিতায়। গড়ে উঠল নতুন ধাঁচের প্রতিষ্ঠান; শুরু হল বিপুল পরিমাণ উৎপাদন। মানুষের সমাজ-জীবন, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বদলে যেতে

থাকল দ্রুতগতিতে। কিন্তু এই পরিবর্তন সকল শ্রেণির চাহিদার অনুবর্তী হল না। বণিক শ্রেণি বিজ্ঞানকে কুক্ষিগত করে রাখল, যাতে তার সুফলের আলো সমাজের বৃহত্তর অংশে পৌঁছাতে না পারে। ফলে উৎপাদন বাড়ল ঠিকই, কিন্তু তার লাভ তুলল মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক ব্যক্তিবর্গই। আর বাকিরা হতে থাকল শোষিত। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের দরিদ্রতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমাজে স্পষ্ট হতে থাকে দুটি শ্রেণি—বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত। উৎপাদন ব্যবস্থার এই নতুন প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কগুলি হয়ে ওঠে আগের থেকে ভিন্নতর। সমাজ-ব্যবস্থার এই নতুন পরিসরেই ব্রেখট চিন্তা করেছেন নতুন ধরনের থিয়েটারের। তাঁর মতে আগামী দিনের শিল্প বিনোদন সংগ্রহ করবে এই নতুন ধরনের উৎপাদনশীলতা থেকে, যা আমাদের জীবিকা ও জীবনযাপনকে বহুগুণ উন্নত করবে।[৩৪]

সময়োপযোগী শিল্প গড়ে তোলার জন্য ব্রেখট থিয়েটারকে শহরতলি এলাকায় নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। যেখানে সেই সব জনতারা থাকে, যারা উৎপাদন করে বিপুল, কিন্তু জীবনযাপন করে কষ্টে। তাদের মধ্যে থেকেই বিনোদনের নতুন পদ্ধতি শিখে নিতে হবে। এই নতুন থিয়েটারের মূল লক্ষ্যই হল শোষিত জনগণের জীবনযাপনকে উন্নীত করা। সেজন্য থিয়েটারকে যুক্ত করতে হবে বাস্তবতার সঙ্গে। তাতে শিক্ষামূলক উপাদান থাকবে প্রচুর, কিন্তু তা যেন বিরক্তিকর হয়ে আনন্দকে নষ্ট না করে। এই থিয়েটার নির্মাণ করবে এমন এক সমাজচিত্রণ যা সমাজকে প্রভাবিত করার কাজে শোষিতদের সমর্থ করে তুলবে। তাদের কাছে অতীত ও বর্তমানের সমাজ সংক্রান্ত নানাবিধ অভিজ্ঞতা এমনভাবে নিয়ে আসবে যাতে দর্শক তার সমুদয় অনুভূতি, অন্তর্দৃষ্টি ও মানসিক প্রৈতি (Impulse) উপভোগ করতে পারে। আনন্দ দেওয়া হবে জ্ঞানের মাধ্যমে যা সমস্যা সমাধানের ভিতর থেকে জন্ম নেয়, ক্রোধের মাধ্যমে যা অত্যাচারিতের প্রতি সহানুভূতির মধ্যে প্রকাশ পায় এবং শ্রদ্ধার মাধ্যমে যারা মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।[৩৫]

ব্রেখটের এই নতুন নাট্যচিন্তায় সমাজজীবন বিষয়ক যেসব উপস্থাপনাগুলি উপস্থাপিত হবে তাদের উৎপাদনী আচরণ হবে সমালোচনামূলক। যার মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব হয়। এই থিয়েটারের উপস্থাপনাগুলিকে ইতিহাসগত আপেক্ষিকতার পটে শনাক্ত করতে হবে। চরিত্রগুলি চলাফেরা করবে সামাজিক চালিকাশক্তির অধীনে—যা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম। দর্শক চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্ম হবে

না; বরং চরিত্রগুলি সমাজের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে উপস্থিত হয়েছে সেই বিশ্লেষণে তারা মনোযোগ দেবে। এখানেই ব্রেখট বেরিয়ে এসেছেন অ্যারিস্টটলের নাট্যচিন্তা থেকে। ব্রেখটের থিয়েটারে দর্শক এটা ভাববে না যে, এরকমভাবে আমিও আচরণ করতাম; বরং ভাববে—যদি আমি অনুরূপ পরিস্থিতির ভিতর থাকতাম। এখান থেকেই সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত ঘটে।[৩৬] থিয়েটারের উপস্থাপন এমনভাবে করতে হবে যাতে দর্শকের মন মুক্ত ও চলিষ্ণু থাকবে, নিরন্তর কাটাজোড়ার কল্পনাশ্রয়ী মন্তাজ চালিয়ে যাবে। এর বাস্তবরূপ দিতে তিনি থিয়েটারে প্রয়োগ করেন 'অ্যালিয়েনেশন ইফেক্ট' তত্ত্বকে। যা চেনা বস্তুকে অচেনা করে তুলবে, পরিচিতকে করবে অপরিচিত। এই কৌশলের উপস্থাপনা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তত্ত্বকে ব্যবহার করার সুযোগ দেয়। যেখানে বলে, স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। পৃথিবী প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল, সেই সঙ্গে মানুষও। একটি মানুষ যেমন, সে সর্বদা তেমন থাকবে না; তার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ সে যা হতে পারে তাকে সেভাবে দেখতে হবে। তাই ব্রেখট বলেছেন—

> 'We must not start with him; we must start on him. This means, however, that I must not simply set myself in his place, but must set myself facing him, to represent us all. That is why the theatre must alienate what it shows.'[৩৭]

দর্শকরা ব্রেখটের থিয়েটারে যে চরিত্রগুলিকে দেখবে তারা কেউ অপরিবর্তনীয় চরিত্র নয়, অসহায় নয়, অদৃষ্টের হাতে নির্ভরশীলও নয়। ঐতিহাসিক কারণেই এরা পরিবর্তনশীল।

সুতরাং ব্রেখটের থিয়েটারচিন্তার মূল কথাই হল দর্শককে কোনও ভাবাবেশে আপ্লুত করা চলবে না। দর্শক থাকবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেজন্যই অচেনাকরণের প্রয়োজন। আর তা সম্পাদনের জন্য অভিনেতাদেরও কিছু দায়িত্ব থাকে। অভিনেতা কখনই নিজেকে অভিনীত চরিত্রে রূপান্তরিত করে দর্শকের সঙ্গে সমানুভূতি স্থাপনের চেষ্টা করবে না। তার কাজ কেবল চরিত্রটাকে দেখানো।[৩৮] চরিত্রের মধ্যে ঢুকে পড়ে সে দর্শককে প্রতারিত করবে না যে, সে আসলে সে নয়, নাটককারেরই চরিত্র।[৩৯] আর এধরনের উপস্থাপনার জন্য একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। অভিনেতাকে সাধারণ মানুষের জীবনসংক্রান্ত

সমকালীন জ্ঞান আয়ত্ব করতে হবে, অংশ নিতে হবে শ্রেণিসংগ্রামে। তার দৃষ্টিকোণ নির্বাচন করতে হবে থিয়েটারের মধ্যে থেকে নয়, থিয়েটারের বাইরে দাঁড়িয়ে।[৪০] অতি তাড়াহুড়ো করে সে চরিত্রকে ধরবে না, বরং কৌতূহলী মন নিয়ে নিরন্তর সে চালিয়ে যাবে নিরীক্ষণ—এর বাইরেও কিছু সম্ভাব্য হতে পারে কি না। যাতে দর্শককে সে প্রভাবিত করতে পারে।[৪১] সেজন্যই অভিনেতা চরিত্রটিকে প্রথমেই কোনও সামগ্রিক ঐক্যের মধ্যে দেখবে না; তাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে তারপর একটা সামগ্রিক রূপ দেবে। চরিত্রকে তার বহুবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে আবিষ্কার করতে হবে; দেখতে হবে অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে তার অভিব্যক্তি কেমন—যেমন সে কখনও গালি পাড়ে, শাপমন্যি দেয়, উপহাস করে, অভিনন্দন জানায়, উপদেশ দেয় ইত্যাদি।[৪২] এভাবেই অভিনেতা নিজের দখলে আনবে 'কাহিনি'-কে। আর থিয়েটারের সবচেয়ে বড়ো ভরসা হল 'কাহিনি'। কারণ কাহিনির মধ্যেই এসে সমন্বিত হয় যাবতীয় অভিব্যক্তি, কাহিনিই ধরে রাখে মনোভাবের আদান-প্রদান ও মানসিক প্রৈতি (Impulse)। এগুলি একত্রে মিলেই দর্শকের 'বিনোদন'-এর পথ প্রশস্ত করে।[৪৩]

রাজনৈতিক নাটকের এই ভিত্তি ও পরিসরের মধ্যেই আমরা এখানে খুঁজে নেব বাংলা নাটকের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ককে। যে নাটকের উৎপত্তি হয়েছিল উনিশ শতকের নবজাগরণের গর্ভে। এখানেই আমরা আলোচনা করে নেব বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং বিভিন্ন ঘটনাসমূহ, যা সাধারণ জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছিল, তার পরিপ্রেক্ষিত নাটকে কতটা ধরা পড়েছে এবং তা কতটা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়েছে। আর তা দেখার জন্যই আমরা বাংলা নাটকের আলোচনা শুরু করেছি একেবারে গোড়া থেকে।

বাংলা নাটকের উৎপত্তি :

আজকের দিনে আমরা নাটক বলতে যা বুঝে থাকি সেটি দেশীয় নয়, তার আমদানি হয়েছে বিদেশ থেকে। উনিশ শতকের ইংরেজি চর্চার মধ্যে এর বীজ নিহিত। অবশ্য এর পূর্বেও আমাদের দেশে নাটক রচিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্বঘোষ-কালিদাস-ভাসের

মতো প্রথম সারির নাটককার যেমন আছেন, তেমনি ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' নাট্যমঞ্চের বিস্তৃত বিবরণও আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরবময় যুগের অবসানের পর সেই ধারা আর তেমনভাবে প্রবাহিত হয়নি। নব্যভারতীয় আর্যভাষার উন্মেষ ও প্রসারের পর্বেও কিছু কিছু সংস্কৃত নাটক লেখা ও চর্চা হয়েছে। সেরকমই বঙ্গদেশে কবি কর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়', রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব', রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভ নাটক' পেয়ে থাকি। সংস্কৃত নাট্য ধারার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে লোকাভিনয়ের ধারা প্রচলিত ছিল। যাকে 'যাত্রা' নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই যাত্রার ভাষা আঞ্চলিক। বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব স্বয়ং চন্দ্রশেখর আচার্যের আঙিনায় কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রাভিনয় করেছিলেন। যার বর্ণনা বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে মধ্যখণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে দিয়েছেন। চন্দ্রশেখর স্বয়ং 'শেখরী-যাত্রা' নামে যাত্রাপালা রচনা করেছিলেন।[৪৪] আঠারো শতকের মধ্যেই বাংলা যাত্রা নিজস্ব সংরূপ গঠন করে ফেলেছিল এবং তা সমাজে বিশেষ প্রসার লাভও করেছিল। এই সময়ের শিশুরাম, পরমানন্দ অধিকারী, সুদাম অধিকারী প্রমুখ যাত্রাওয়ালাদের নাম যাত্রার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

তবে আধুনিক বাংলা নাটক এসব যাত্রাপালার উত্তরসূরি নয়। এ সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছেন—

> 'বিলাতি স্টেজ-অভিনয় দেখিয়াই আমাদের দেশের লেখকেরা নাটক লেখায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন। নাটক বলিতে এখন যাহা বুঝি তাহা আমাদের দেশে ইংরেজ আমলের আগে ছিল না। তখন ছিল যাত্রা। তাহার সহিত নাটকের খানিকটা মিল আছে নিশ্চয়ই, অমিলও আছে অনেকটা। বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি যাত্রা হইতে হয় নাই, তবে যাত্রার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।'[৪৫]

বাংলায় প্রথম নাট্যশালার আমদানি করে ইংরেজরা। তখনও তারা ভারতের শাসক হয়ে ওঠেনি, ছিল বণিক মাত্র। তাদের প্রথম প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালা 'ওল্ড প্লে-হাউস' পলাশির যুদ্ধের একবছর আগে ১৭৫৬ সালে সীরাজদৌল্লা কর্তৃক কলকাতা আক্রমণের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।[৪৬] পরে ইংরেজদের হাতে শাসন ক্ষমতা আসার পর তৈরি হতে থাকে 'দি নিউ প্লে-হাউস' বা 'ক্যালকাটা থিয়েটার' (১৭৭৫), 'মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার'

(১৭৮৭), 'সাঁ সূসী থিয়েটার' (১৮৩৯) ইত্যাদি। তবে এগুলিতে বাংলা নয়, সাধারণত ইংরেজি নাটকই অভিনীত হত। প্রথম বাংলা ভাষায় নাটক অভিনীত হয় রাশিয়া থেকে আগত হেরাসিম লেবেডেফ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গলী থিয়েটার' (১৭৯৫)-এ। যখন ইংরেজদের থিয়েটারে ইংরেজি ভিন্ন কোনও প্রাদেশিক ভাষায় নাট্যাভিনয় হচ্ছিল না, দেশীয় ক্ষেত্রেও তেমন কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না, সেই সময় এখানে প্রথম বাংলা ভাষায় নাটক অভিনয়ের সন্ধান মেলে—এম. জোডরেল রচিত 'দি ডিস্‌গাইস্‌'-এর বাংলা অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল'।

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য মডেলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তৈরি এবং ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার হতে থাকে। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের (অধুনা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা ইংরেজি সাহিত্যচর্চা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কলকাতার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে নাট্যাভিনয় হত। সেক্ষেত্রে শেক্সপিয়ারের প্রাধান্যই ছিল বিশেষ। যেমন হিন্দু কলেজে 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' (১৮২৮, ১৮৩১), মেট্রোপলিটন অ্যাকাডেমিতে 'জুলিয়াস সিজার' (১৮৫২) ইত্যাদি।[৪৭] হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর (১৮০৯-১৮৩১) সংস্পর্শ একদল ছাত্রকে বিশেষ প্রভাবিত করে—যাঁরা ইতিহাসে 'নব্যবঙ্গ' নামে পরিচিত। এঁদের উপর পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব এতই প্রবল ছিল যে দেশীয় সমস্ত কুসংস্কার, রীতি-নীতির প্রতি তাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তবে এঁদের সুরাপানের আধিক্যতা এবং নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণের প্রবণতা সামাজিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাবও ফেলেছিল। এঁদের পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্যের দিক্‌নির্দেশ করেছিল। হিন্দু কলেজের আর একজন শিক্ষক রিচার্ডসন শেক্সপিয়ার পড়াতেন। যাঁর পড়ানোর গুণগত মানের উচ্চতর প্রশংসা পাওয়া যায় রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত'-এ। রিচার্ডসন 'চৌরঙ্গী থিয়েটার'-এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন এবং ছাত্রদের থিয়েটারমুখী হওয়ার জন্য উৎসাহ দিতেন। এভাবেই পাশ্চাত্য নাটক ও থিয়েটারের সঙ্গে তৎকালীন ছাত্র সমাজের অনুরাগ ও যোগসূত্র তৈরি হয়।

যখন ইংরেজি শিক্ষার ফলে বাঙালি ছাত্র সমাজ পাশ্চাত্য নাটকের স্বাদ গ্রহণ করছিল, তখন কলকাতার ধনীগৃহগুলি প্রমোদ অনুষ্ঠানে সেই প্রাচীনপন্থী যাত্রা, পাঁচালি, হাফ-আখড়াই নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। ক্রমশ তাদের এইসব অনুষ্ঠান ইংরেজি সাহিত্যচর্চা করা ছাত্রদের কাছে ঘৃণ্য বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।[৪৮] ফলে দ্রুত পাশ্চাত্য নাট্যশালার আদলে দেশীয়

নাট্যশালা গড়ার প্রয়োজন বোধ হয়। তৈরি হয় বাঙালির প্রথম নিজস্ব থিয়েটার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের (১৮০১-১৮৮৬) 'হিন্দু থিয়েটার' (১৮৩১)। কিন্তু তখনও রঙ্গালয়গুলি হয় ইংরেজি, নয় সংস্কৃত নাটকের ইংরেজি অনুবাদ মঞ্চস্থ করেই ক্ষান্ত থাকত। উপযুক্ত বাংলা নাটকের অভাব এর অন্যতম কারণ। সেই অভাব মেটানোর জন্যই পরবর্তীতে রচিত হয় বাংলা নাটক। প্রথম বাংলা মৌলিক নাটকের দাবি রাখে যোগেশচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) এবং তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২)।

সমাজসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক :

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ চলে গেল বাংলা নাটক রচনার কৌশল আয়ত্ব করতে। অনুবাদের পথ ছেড়ে যখন বাংলা নাটক নিজস্ব সংরূপ গঠন করতে সক্ষম হল, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখের হাতে যখন তা সার্থকতায় পর্যবসিত হল তখন তাতে বাংলার ভাববিপ্লব এসে ধরা দিল।

উনিশ শতক ও তার পূর্বে ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় কুসংস্কারের সাম্রাজ্য প্রবল প্রতাপের সঙ্গে অধিষ্ঠিত ছিল। যার ফলে ভারতীয় সমাজ বিশ্বজনীনতা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করত। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার ছোঁয়া যুক্তিবোধ ও সুস্থ সমাজ গড়ার তাগিদ দেয়। কিন্তু ধর্মের মধ্যে যে কুসংস্কারগুলি সেসময় জাঁকিয়ে বসেছিল তার সংস্কার না ঘটালে সেটা সম্ভব ছিল না। কারণ ভারতের মতো ধর্মপ্রাণ দেশে, যেখানে জীবনের প্রতিটি যাপনে ধর্ম বিশেষভাবে জড়িত, আর সে ধর্ম যদি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়, সামাজিক ভেদাভেদ তৈরি করে তাহলে 'জাতি' (Nation) গঠন করা সে দেশের পক্ষে সম্ভব হবে না। ফলে ঔপনিবেশিক যুগের একেবারে প্রথম পর্বে ভারতবর্ষে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। বাংলায় সেই সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের মতো ব্যক্তিত্বরা।

সমাজ সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। রামমোহন রায় ১৮ জানুয়ারি ১৮১৮ সালে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে লেখেন—

'...I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions and sub-division among them has entirely deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise... It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort.'[৪৯]

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই শুরু হয়েছিল সমাজ সংস্কার আন্দোলন। বাংলায় বেশিরভাগ আন্দোলন হয়েছে নারীদের স্বাবলম্বী করতে। কারণ সে সময় নারীদের অবস্থাই ছিল বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। কন্যা সন্তানের জন্ম ছিল পরিবার ও সমাজের কাছে বোঝা। তাদের বিবাহ দেওয়া হত সামাজিক কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচার জন্য। তাদের স্বাধীনতা কোনও দিক দিয়েই ছিল না। কুলীন প্রথার দরুন এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল বলেই বাল্য বয়সেই তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত অধিক পত্নী থাকা কোনও ব্যক্তির সঙ্গে। তাতে সেই ব্যক্তির বয়স যতই হোক না কেন। বাংলায় একজন আশি বছর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রায় ২০০ স্ত্রী ছিল, যার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ স্ত্রীর বয়স ছিল মাত্র আট বছর।[৫০] এর ফলে নারীদের ভাগ্যে জুটত সপত্নী সমস্যা, অসুখী বিবাহ জীবন, বাল্য-বৈধব্য ইত্যাদি। প্রথম দিকে সহমরণ প্রথাও সমাজে প্রচলিত ছিল। ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ সালে রামমোহনের নেতৃত্বে এবং তৎকালীন লর্ড বেন্টিঙ্কের সহযোগিতায় এই সতীদাহ প্রথার বিলোপ ঘটে। তবে সবথেকে বেশি সমস্যা হয়েছিল বিধবাবিবাহ প্রচলন করতে। বিদ্যাসাগর এর জন্য প্রবল আন্দোলন সংগঠিত করেন। যার বিরুদ্ধতাও এসেছিল রাধাকান্ত দেবদের মতো তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ থেকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ১৮৫৬ সালের ১৬ জুলাই আইন করে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হয়। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধের জন্যও জনমত সংগঠিত হয়েছে। নারীশিক্ষা প্রচারের জন্যও একাধিক মহিলা স্কুল, কলেজের সূচনা ঘটেছে।

বাংলার এই সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সময় প্রথম যুগের বাঙালি নাটককারদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরাও নিজেদের নাটকের পটভূমি ও বিষয় নির্বাচনে তৎকালীন সামাজিক সমস্যাগুলিকে বেছে নিয়ে যুগধর্ম ও সামাজিক ধর্ম পালন করেছেন। ফলে বাংলা নাটকের আদি যুগেই তা সমাজ সংস্কারের অস্ত্র হয়ে উঠল। বিধবা-বিবাহের সমর্থনে উমেশচন্দ্র মিত্র 'বিধবা-বিবাহ নাটক', যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় 'চপলা চিত্ত চাপল্য', শিমূয়েল পিরবক্স 'বিধবা-বিরহ নাটক', মনোমোহন বসু 'আনন্দময় নাটক' নাটক লেখেন। বহু-বিবাহ ও সপত্নী সমস্যা নিয়ে যোগেশচন্দ্র গুপ্ত 'কীর্তিবিলাস', রামনারায়ণ তর্করত্ন 'নব-নাটক' ও 'উভয় সংকট', মনোমোহন বসু 'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটক লেখেন। বাল্য-বিবাহের কুফল নিয়ে লেখেন রমেশচন্দ্র দত্ত 'বাল্যবিবাহ', শ্যামাচরণ শ্রীমানী 'বাল্যদাহ নাটক'। কৌলীন্য প্রথার বিরোধিতা করে রামনারায়ণ তর্করত্ন লেখেন 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪)। এই সময় নব্যবঙ্গ যুবকদের উন্নাসিক জীবন ও অত্যধিক মদ্যপান বাংলার সামাজিক জীবনে ব্যাধির মতো ছড়িয়েছিল। তাদের প্রতি বিরোধিতাও নাটকে উঠে এসেছে। মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং দীনবন্ধু মিত্রর 'সধবার একাদশী' প্রহসন দুটিতে সেই নব্যবঙ্গ সমাজের অধোগতির উপর ব্যঙ্গের বাণ চালানো হয়েছে। তবে এই সব নাটকগুলির মধ্যে 'কুলীনকুলসর্বস্ব', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'সধবার একাদশী' ছাড়া বাকি নাটকগুলিতে সমাজ সমস্যাই প্রধান হয়ে উঠেছে, তেমন কোনো নাটকীয় গুণ বজায় থাকেনি। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হয়, নাটকগুলি সমাজের প্রগতির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। পরবর্তী সময়ে যে প্রগতি আন্দোলন বা প্রগতি নাট্যের ধারা প্রবাহিত হয়েছে তার মূল এইসব নাটকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

নীলদর্পণ : বাংলার প্রথম রাজনৈতিক নাটক :

সমাজ সংস্কার আন্দোলনগুলি রাজনৈতিক হলেও তার রাজনীতি নিহিত ছিল নিজেদের সমাজের মধ্যযুগীয় কুসংস্কার মুক্ত করার মধ্যেই। ব্রিটিশ সরকার বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধাচরণ তার লক্ষ্য ছিল না। উপরন্তু আন্দোলনের উদ্দেশ্যই ছিল ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য নিয়ে, তাদের দিয়ে আইন পাস করিয়ে কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গড়ার। তাকে কেন্দ্র করে রচিত নাটকগুলিরও উদ্দেশ্যও ছিল তাই। ফলে এই নাটকগুলিতে রাজনৈতিক

উপাদান থাকলেও তা নিজেদের সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে; রাষ্ট্রের শোষণের কোনও বিরোধিতা এতে আসেনি। সে দিক থেকে 'নীলদর্পণ' নাটকের স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে, দীনবন্ধু মিত্র এতে প্রথম ব্রিটিশ সরকারের শোষণের দিকটা তুলে ধরেছেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ আসতে না আসতেই ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী ও শোষকের চেহারা স্পষ্ট হতে থাকে। সেই নিয়ে বিরোধও বাঁধতে শুরু করে। সে রকমই একটা বিরোধ তৈরি হয়েছিল বাংলায় নীল চাষকে কেন্দ্র করে। রাসায়নিকভাবে নীল তৈরি করার পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে নীল জমিতে চাষ করেই উৎপাদন করা হত। আর এই নীলচাষের মাধ্যমে নীলকর সাহেবরা অত্যধিক মুনাফা লাভ করত। সেই লোভে নীলকর সাহেবরা সাধারণ কৃষকদের দাদন দিয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিত এই মর্মে যে, কৃষকদের নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে নীলচাষ করতে হবে এবং উৎপাদিত নীল নির্দিষ্ট দামে নীলকর সাহেবদের কাছেই বিক্রি করতে হবে। সেই শর্তের বিরুদ্ধাচরণ করলেই চাষিদের ওপর চলত অত্যাচার। সাধারণত যেসব অত্যাচার চলত সেগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে এভাবে—১. হিংসাত্মক আক্রমণ, ফলে এ দেশীয়দের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে; ২. পাওনা আদায়ের জন্য এ দেশীয় লোকেদের বা তাদের গরু-বাছুর গুদামে আটক করে রাখা; ৩. ভাড়াটে লোকজন দিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে নীলকরদের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ব্যাপৃত হওয়া; ৪. চামড়া মোড়ানো বেতের দ্বারা কৃষকদের প্রহার করা।[৫১] আইন-আদালত করেও তা থেকে নিষ্কৃতি মিলত না।

দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটক এই বাস্তব পটভূমির উপর রচনা করেছেন। সেখানে এমন কোনও ঘটনার সংস্থান নেই যার কোনও বাস্তব ভিত্তি ছিল না। এখানেই প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও 'নীলদর্পণ'-এর বিপ্লবী সত্তাকে খণ্ডন করে প্রবোধবন্ধু অধিকারী তিনটি কারণ দেখিয়েছেন—

> 'প্রথমত, নীলবিদ্রোহ মোটেই বিপ্লবাত্মক ছিল না, কাজেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দিক থেকে 'নীলদর্পণ' বিপ্লবের প্রতিফলন নয়; দ্বিতীয়ত, 'নীলদর্পণ' প্রধানত নীলকর সাহেবদের পাশবিক অত্যাচারের ছবি, কৃষকদের প্রতিরোধ যতটুকু বাস্তব জগতে ছিল তাও মোটের উপর ক্ষীণভাবে গ্রন্থটিতে প্রতিফলিত হয়েছে; তৃতীয়ত, দীনবন্ধুর রাজনীতি ছিল

> ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশানে রমানাথ ঠাকুর ও হরিশ মুখার্জীর রাজনীতি, অর্থাৎ নীল চাষীদের প্রতি অত্যাচারকে UnBritish বলে প্রচার করে 'ন্যায়পরায়ণ' ব্রিটিশের কাছ থেকেই সুবিচার প্রার্থনা করার রাজনীতি।'[৫২]

তাঁর এই কারণগুলি নির্দ্বিধায় সমর্থন করা যায় না। কারণ কোনো বিদ্রোহ বিপ্লবের পর্যায়ে না পৌঁছালে যে, তাকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্য বিপ্লবী হতে পারে না এটা অযৌক্তিক মতামত। কারণ সাহিত্যের সত্য মানে 'কী হয়েছে' এটাই একমাত্র কথা নয়, বরং 'কী হতে পারে' বা 'কী হওয়া উচিৎ' এটাও সাহিত্যের সত্য বলে গ্রাহ্য। দ্বিতীয়ত, 'নীলদর্পণ'-এ কৃষকদের শ্রেণিশত্রুকে ঘৃণা করার রূপটি ধরা পড়ে তোরাপ চরিত্রের মধ্যে—যে নীলকর সাহেবকে ভয় না পেয়ে তাকে প্রহার করতে পারে, কামড়ে তার নাক ছিঁড়ে নিতে পারে। তৃতীয়ত, দীনবন্ধু যখন এই নাটকটি রচনা করেছেন তখনও ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তেমন বলিষ্ঠভাবে সংগ্রাম করার কোনও উপায় ছিল না। নাটকটি রচনার পূর্বে সিপাহী-বিদ্রোহের মাধ্যমে যেটুকু ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম তৈরি হয়েছিল তাও সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়ে গেছে। ফলে নাটককার জানতেন নিজের কর্তব্য ও সীমা। তাই তিনি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থেকেই এই সমস্যার সমাধান করার পক্ষপাতী এবং তা তিনি ব্যক্তও করেছেন নাটকের ভূমিকায়—

> 'নীলকরনিকরকরে নীল-দর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ২ মুখ সন্দর্শনপূর্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার-শ্বেতচন্দন ধারণ করুণ, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা।'[৫৩]

সুতরাং 'নীলদর্পণ' নাটকের দিক থেকে রাজনৈতিক নাটকের পূর্বসূরি। পরবর্তীকালে বাংলা নাটকে প্রতিবাদের যে স্বরূপ ফুটে উঠেছিল তার সূচনা করতে হয় এই নাটক দিয়েই।

'নীলদর্পণ' নাটকের প্রভাব সেই সময়ের সমাজে এবং নাটককার মহলে এতই জোরালো ভাবে পড়েছিল যে, তাকে অনুসরণ করে 'দর্পণ' নাটক রচনার একটি ধারা তৈরি হয়ে যায়। যার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল সমাজের মধ্যে বসে থাকা বিভিন্ন শ্রেণির

শোষকের রূপ পরিস্ফুট করে শোষিতদের মঙ্গল কামনা করা। এই ধারার নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে মীর মশারফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩), প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'পল্লীগ্রাম দর্পণ' (১৮৭৩), যোগীন্দ্রনাথ ঘোষের 'কেরাণী দর্পণ' (১৮৭৪), দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'চা-কর দর্পণ' (১৮৭৫) ও 'জেল দর্পণ' (১৮৭৫), প্রিয়নাথ পালিতের 'টাইটেল দর্পণ' (১৮৮৩), গোপালকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ দর্পণ' (১৮৮৫), সুন্দরীমোহন দাসের 'মিউনিসিপ্যাল দর্পণ' (১৮৯২) ইত্যাদি।

জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও বাংলা নাটকে দেশাত্মবোধ :

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই ব্রিটিশ সরকারের শোষণের রূপ ও সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ধরা পড়তে থাকে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সে নিয়ে বিরোধ ও বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। নীল-বিদ্রোহের কথা আগেই বলেছি; এছাড়াও সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-১৮৫৭), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৮) ভারতবাসীকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। মুসলমানসমাজ অবশ্য প্রথম থেকেই ব্রিটিশ-বিরোধী ছিল। কারণ তাদেরকে পরাজিত করেই ব্রিটিশরা ভারতের সাম্রাজ্য দখল করেছিল—যা তারা ভালোভাবে নেয়নি। হিন্দু সম্প্রদায় প্রথম থেকেই ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছিল, নিজেদের সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার করছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে। প্রথম দিকে সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করলেও পরাধীনতার গ্লানি বাঙালি সমাজের অনুভব করতে খুব বেশি সময় লাগেনি। ফলে শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু সমাজের মনে ক্রমশ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়। কিন্তু তাদের কাছে তখনও স্বাধীনতা অর্জনের সুস্পষ্ট কোনও পথ ছিল না। তখন স্বাধীনতার মর্মবাণী সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ায় ছিল জরুরি, জাতি (Nation) গঠন করা ছিল আবশ্যক। সেই স্পৃহা থেকেই রাজনারায়ণ বসু তৈরি করেন 'Society for the Educated Natives of Bengal' (১৮৬৬) এবং 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'। সেই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখেই 'হিন্দু মেলা'-র পরিকল্পনা করা হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। এই মেলার কর্ণধার নবগোপাল মিত্র মেলার চতুর্থ অধিবেশনে 'জাতীয় সভা' বা 'ন্যাশনাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৪] অবশ্য এগুলির মূল উদ্দেশ্যই ছিল হিন্দু সমাজের ঐক্য প্রত্যিষ্ঠা করা। হিন্দু জাগরণই

তখন তাদের কাছে জাতীয় জাগরণ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল। শিশিরকুমার ঘোষের প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান লীগ' (১৮৭৫) এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৬) জাতীয় ভাবোদ্দীপনা ছড়াতে সাহায্য করেছিল।

জাতীয়তাবাদের এই উদ্দীপনা তৎকালীন বাঙালি সমাজকে রাজনীতি সচেতন করেছিল। যদিও সেই রাজনীতি ছিল হিন্দু-জাগরণের রাজনীতি। ১৮৭০-১৮৮০ এই সময়পর্বে রচিত সাহিত্যের মধ্যেও আমরা তার স্ফুরণ দেখতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা এই রাজনীতিরই ফল। এছাড়াও রয়েছে তাঁর একাধিক প্রবন্ধ ও ঐতিহাসিক উপন্যাস। কাব্য সাহিত্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতসঙ্গীত' (১৮৬৯), 'ভারতভিক্ষা' (১৮৭৫), নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশির যুদ্ধ' (১৮৭৬) ইত্যাদি এই জাগরণেরই ফসল।

নাটকের ক্ষেত্রে এর প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ। প্রতিষ্ঠিত হয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' (১৮৭২)। যার মধ্য দিয়ে সাধারণ জনগণের কাছে থিয়েটারের দ্বার উন্মুক্ত হয়। বাংলা নাটকের আদিযুগে যে সমাজ সংস্কারের পথ ধরে নাটক অগ্রসর হচ্ছিল, সেই নাটকের গতি ১৮৭০ আসতে আসতে বাঁক নেয় জাতীয়তাবাদ বা দেশাত্মবোধের দিকে। নাটকের কাহিনি সামাজিক পরিবেশ থেকে সরে এসে পর্যবসিত হয় ঐতিহাসিক পরিবেশে। হিন্দুদের গৌরবগাথা হয়ে ওঠে নাটকের বিষয়। আবির্ভাব ঘটে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তাঁর রচিত নাটকগুলির বিষয়ে এসেছে হিন্দুদের বীরত্বের কথা ও গৌরবের পরিচয়। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে পুরুর বিক্রম-কাহিনি নিয়ে রচনা করেছেন 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), রাজপুতদের বীরত্বগাথা এসেছে 'সরোজিনী' (১৮৭৫)-তে, প্রতাপসিংহের স্বদেশপ্রেম অবলম্বন হয়েছে 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯) নাটকে, আর 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) রচিত হয়েছে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালীন তালুকদার শুভাসিংহের বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে। এছাড়াও কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' (১৮৭৩), 'ভারতে যবন' (১৮৭৪), হরলাল রায়ের 'হেমলতা' (১৮৭৩), 'বঙ্গের সুখাবসন' (১৮৭৪), উমেশচন্দ্র গুপ্তর 'হেমনলিনী' (১৮৭৪), 'বীরবালা' (১৮৭৫), 'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক' (১৮৭৫) ইত্যাদি নাটক এ প্রসঙ্গে পাওয়া যায়।

বাংলা নাটকে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ বিরোধিতা ও নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন :

বাংলা নাটকের ইতিহাসে উপেন্দ্রনাথ দাসই প্রথম ব্রিটিশ সরকারের শাসনের বিরোধিতা করে নাটক রচনা করেন। পূর্বে 'নীলদর্পণ' নাটকে ইংরেজদের শোষণের চিত্র উঠে এসেছে ঠিকই, কিন্তু তাতে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা ছিল না সে কথা আগেই বলা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী চেতনার ফলে রচিত দেশাত্মবোধক নাটকগুলিতেও প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ বিরোধিতা নেই। সেখানে ইতিহাসের পটভূমিতে নাটক রচনা করে এমন একটা ঐতিহাসিক প্লট তৈরি করা হত এবং সেই প্লট অনুযায়ী চরিত্রের সংলাপে এমন কথা উচ্চারিত হত যা পরাধীনতার গ্লানি প্রকাশ করত। কিন্তু সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করে নাটক রচনার প্রথম কৃতিত্ব উপেন্দ্রনাথ দাসই অর্জন করেন। তিনি মাত্র তিনটি নাটক রচনা করে বাংলা নাটকের ইতিহাসে, বিশেষ করে রাজনৈতিক নাটকের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭৪) নাটকে একদিকে প্রেম ও অন্যদিকে স্বাদেশিকতা বিষয় হয়ে এসেছে। তবে শরৎ ও সরোজিনীর প্রণয়ের কাহিনির থেকে স্বাদেশিকতায় এখানে প্রকট। আশুতোষ ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> 'আমির খাঁ দস্যু চরিত্রের মধ্য দিয়াই প্রধানত তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা প্রধানত এই যে সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত দেশ স্বাধীন হইতে পারে না, তবে আমির খাঁ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার স্বার্থবোধে আচ্ছন্ন, শরতের মনে তেমন কোনও সঙ্কীর্ণতা নাই, তবে মুসলমান সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাহে না, তাহাও সত্য। বাঙালির মনে যে সশস্ত্র সংগ্রামের ভাবনা কতদিন আগে কি ভাবে নাটকের মধ্যে দিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা এই নাটক হইতে জানিতে পারা যায়।'[৫৫]

উপেন্দ্রনাথ দাসের যে দুটি নাটক সে সময়ে ব্রিটিশ সরকারকে বেশি উত্তেজিত করেছিল সেগুলির একটি 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' এবং অপরটি 'গজদানন্দ ও যুবরাজ'। ১৮৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' প্রথম অভিনীত হয়।[৫৬] এখানেও দেশাত্মবোধের কথা এসেছে সুরেন্দ্র চরিত্রের পাশাপাশি বিভিন্ন উপকাহিনিগুলির মধ্যে। অবশ্য 'শরৎ-সরোজিনীর' মতো দেশাত্মবোধ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়নি। বদলে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব দেখানোই হয়েছে বেশি। নবগোপাল

মিত্রর হিন্দুমেলাতে যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রচার হত তার প্রতিও উপেন্দ্রনাথ দাসের তেমন আস্থা ছিল না। সেজন্যই এই নাটকের 'বিজ্ঞাপনে' দেখি—

> 'নবগোপাল মিত্র একটি পাষণ্ড জানোয়ার্—বৎসর বৎসর হিন্দুমেলা করিয়া কি হইতেছে? মৃতব্যক্তিকে কে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারে। আবার শুনিতেছি না কি 'কলিকাতা আসোসিয়েশন্' নামে একটি সভা স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। শিশির কুমার ঘোষের শ্রাদ্ধ হইতেছে।—এদিকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' করিতেছেন! আমার পিণ্ড চট্‌কাইতেছেন্। কে পড়ে?'[৫৭]

এখান থেকেই স্পষ্ট হয় নাটককার কোন পথের পথিক। তার নাটক সেই ভাবনায় ভাবিত হয়েছে।

১৮৭৫ সালের শেষের দিকে মহারানী ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স অফ ওয়েলস (পরে সপ্তম এডওয়ার্ড) কলকাতায় এলে সে সময়ের হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালের ৩ জানুয়ারি ভবানীপুরে নিজগৃহে আমন্ত্রণ করে তাঁকে নিয়ে আসেন। জগদানন্দর পত্নী ও পুরনারীরা শঙ্খ বাজিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে প্রিন্সকে বরণ করে নেন। এই ঘটনা কলকাতার তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালি সমাজে বিরূপ প্রভাব ফেলে। সংবাদপত্রে বিস্তর লেখালেখি ও প্রতিবাদ হয়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাজিমাৎ' নামে একটি শ্লেষাত্মক কবিতা লেখেন। আর উপেন্দ্রনাথ দাস প্রহসন রচনা করেন 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামে। যেটি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।[৫৮] ২৩ ফেব্রুয়ারি এই প্রহসনটি দ্বিতীয়বার অভিনয় হয় 'গজদানন্দ' নামে। এর পরেই একজন রাজভক্ত প্রজাকে ব্যঙ্গ করার জন্য পুলিশ এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেয়। কিন্তু ২৬ ফেব্রুয়ারি সেটি 'কর্নাটকুমার' নাটকের সঙ্গে পুনরায় অভিনীত হয় 'হনুমানচরিত্র' নামে। পুলিশের হুকুমে 'কর্ণাটকুমার' ও 'হনুমানচরিত্র' দুটি নাটকই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১ মার্চ পুনরায় 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের সঙ্গে পুলিশকে ব্যঙ্গ করে 'The Police of Pig and Sheep' নামে একটি প্রহসন অভিনীত হয়। পুলিশ কমিশনার স্টুয়ার্ট হগ ও সুপারিনটেনডেন্ট ল্যামের নামানুসারে 'Pig' ও 'Sheep' দেওয়া।[৫৯] ২৬ ফেব্রুয়ারি থিয়েটারের ডিরেক্টর হিসেবে এবং ১ মার্চ 'Actress' শিরোনামে উপেন্দ্রনাথ

দাস দুটি ইংরেজিতে ভাষণ দেন যেখানে মঞ্চের উপর পুলিশের হস্তক্ষেপ এবং রঙ্গালয়ের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত।[৬০]

এসব ঘটনার জন্য তৎকালীন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ২৯ ফেব্রুয়ারি একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন এবং দ্রুত এটি আইনে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর হন। ৪ মার্চ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাট্যের অভিনয় চলাকালীন সেখানে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ল্যাম্বর্ট সাহেব পুলিশ নিয়ে হানা দেন এবং উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর প্রমুখদের গ্রেপ্তার করেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তাঁরা 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নামে যে নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন সেটি অশ্লীল। ম্যাজিস্ট্রেট ডিকেন্সের বিচারে উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বসুর বিনাশ্রমে একমাস করে কারাদণ্ড হয় এবং বাকিদের ছেড়ে দেয় ৮ মার্চ। কিন্তু ২০ মার্চ 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকে অশ্লীলতার কিছুই নেই বলে প্রমাণিত হলে তাঁরাও ছাড়া পায়। মার্চ মাসে আইন সচিব হবহাউস 'Dramatic Performance Control Bill' নামে যে আইনের খসড়া কাউন্সিলে পেশ করেন তা ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে আইনে পরিণত হয় 'The Dramatic Performance Control Act of 1976' নামে।[৬১] এই আইন জারি করার পিছনে অবশ্য 'চা-কর দর্পণ' এবং নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র মিত্রর গাইকোয়ারের বিচার সংক্রান্ত নাটক 'গুইকোয়ার নাটক'-এরও ভূমিকা আছে।[৬২] আইন প্রণয়নের সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে হবহাউস 'গজদানন্দ' নাটকের সঙ্গে 'চা-কর দর্পণ'-এর অভিনয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন।[৬৩]

বঙ্গভঙ্গ-স্বদেশি আন্দোলন ও বাংলা নাটক :

'নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' পাস হওয়ার পর উনিশ শতকে আর জাতীয়তাবাদী-দেশাত্মবোধক বা ব্রিটিশ-বিরোধী নাটক রচনার প্রয়াস নজরে আসে না। তার উপর প্রতাপচাঁদ জহুরী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কিনে নিলে পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের যাত্রা শুরু হয়। মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে নাটক রচনা ও পরিচালনা হতে থাকে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ হয়ে ওঠেন এই সময়ের সব থেকে প্রভাবশালী নাটককার। একাধিক পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক রচনা ও পরিচালনা হতে থাকে—যা তৎকালীন রাজনীতি থেকে বহুদূরে অবস্থান করে। অথচ এই সময় ব্রিটিশ সরকার একাধিক জনবিরোধী আইন পাস করে, যেমন

'ভারনাকুলার অ্যাক্ট' (১৮৭৮) এবং তার প্রতিবাদে আন্দোলন সংগঠিত হয়; ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং তারপর একাধিক সংগ্রাম ইত্যাদি। কিন্তু এসব রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাবে কোনও নাটক রচিত হতে দেখা যায় না।

বাংলা নাটককে পুনরায় রাজনীতিমুখী হতে দেখা গেল বিশ শতকের একেবারে গোড়ায় বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। স্যার হার্বার্ট হোপ রিজলের তৈরি করা রিপোর্ট ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর মাসে 'রিজলে-পেপার' নামে প্রকাশ পায়।[৬৪] যেখানে বঙ্গ-বিভাজনের প্রস্তাব থাকে। এই সময় ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন। বঙ্গভঙ্গের আসল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। এই সময় ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছিল এবং তার স্নায়ুকেন্দ্র ছিল কলকাতা তথা বঙ্গভূমি। সুতরাং বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের শক্তি খর্ব করাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য। এছাড়াও ধর্মীয়ভাবে বাঙালিদের হিন্দু-মুসলমানে বিভক্ত করাও ছিল অন্যতম লক্ষ্য। ফলে সমস্ত বঙ্গভূমিতে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, পৃথ্বিশচন্দ্র রায় প্রমুখ নেতারা 'বেঙ্গলী', 'হিতবাদী', 'সঞ্জীবনী' ইত্যাদি পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রচার চালান। ১৯০৩ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে রিজলে পরিকল্পনাকে 'জঘন্য' আখ্যা দেওয়া হয়।[৬৫] একাধিক প্রতিবাদ সভা, আবেদন-নিবেদন, সংবাদপত্রে এর বিরুদ্ধে প্রচার সত্ত্বেও ১৯ জুলাই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়ে যায়। তার প্রতিবাদে ৭ আগষ্ট কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক সভা থেকে পাস হয় 'বয়কট' প্রস্তাব।[৬৬] এখান থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় স্বদেশি আন্দোলনের পথ চলা। ১৬ অক্টোবর অবশেষে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সম্পন্ন হলে সেই দিন কলকাতায় হরতাল ডাকা হল, সকলে অরন্ধন পালন করে উপবাস করে, গঙ্গা স্নান করে 'বন্দেমাতরম' গাইতে গাইতে মিছিল করে, ঐক্যের প্রতীক হিসেবে রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান করে। নতুন করে জাতীয়তাবাদ ধ্বনিত হয়। স্বদেশি আন্দোলনে স্বনির্ভরতা বা আত্মশক্তির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল যাতে জাতীয় মর্যাদা, সম্মান ও আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। স্বদেশি শিক্ষা ও স্বদেশি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা স্বনির্ভরতার কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। অতি দ্রুত স্বদেশি আন্দোলন ও বিদেশি পণ্য বয়কটের বার্তা ছড়িয়ে যায় সারা দেশে। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশিকে সমর্থন করলেও বয়কটকে সমর্থন করেননি। লোকমান্য তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা এই আন্দোলনকে পূর্ণ-

রাজনৈতিক গণ-সংগ্রামে সংগঠিত করার পক্ষে ছিলেন। স্বদেশি ও বয়কটের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাঁদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল পূর্ণ-স্বাধীনতা বা 'স্বরাজ'। এখানেই জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে মতপার্থক্যগত বিভাজন হতে শুরু করে; যা ১৯০৭ সালে সুরাট অধিবেশনে বাস্তব রূপ নেয়।[৬৭]

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনের ছাপ ছিল গভীর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মুকুন্দ দাস, সৈয়দ আবু মহম্মদ একাধিক দেশাত্মবোধক গান লেখেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি এই সময়ে লেখা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোগল, রাজপুত, অজন্তার চিত্রকলার প্রতি আকৃষ্ট হন। নাটকের ক্ষেত্রেও ঠিক সেরকমই প্রভাব পড়েছিল। এই সময় জাতীয় বীর চরিত্রের সন্ধান চলতে থাকে; যার আদর্শকে সামনে রেখে জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ ও জাতীয় চেতনা গড়ে তোলা যায়। এই জাতীয় চাহিদার কাজে নাটককাররাও এগিয়ে এলেন অনিবার্যভাবে। ফলে পুরাণাশ্রয়ী ভক্তিমূলক পালাসাধন ছেড়ে পুনরায় রচিত হতে থাকল ঐতিহাসিক দেশাত্মবোধক নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৫ আগস্ট ১৯০৩ সালে স্টার থিয়েটারে।[৬৮] যদিও এটি বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার কথা প্রকাশ্যে আসার পূর্বেই রচিত হয়েছিল তবুও এর মধ্যে যথেষ্ট দেশাত্মবোধক প্রেরণা থাকায় পরবর্তী সময়ে যখন বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে প্রবল আন্দোলন চলছে তখন এই নাটক বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্বদেশী আন্দোলন চলাকালীন দেশাত্মবোধের প্রেরণাতে তিনি লেখেন 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৭), নন্দকুমার (১৯০৮), 'অশোক' (১৯০৮), 'বাঙ্গালার মসনদ' (১৯১০) ইত্যাদি। এই সব নাটকে ইতিহাসের তথ্য নিষ্ঠতার থেকে দেশাত্মবোধই বেশি ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার গোস্বামী বলেছেন—

> '...তখন নাট্যকারের মূল লক্ষ্য ছিল দেশাত্মবোধ প্রচার। কারণ স্বদেশী আন্দোলনের আবহাওয়ায় দর্শক-মন দেশাত্মবোধের আদর্শকে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত ছিল। তাই ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা ছেড়ে যে কোনও সম্ভাব্য সূত্র অবলম্বন করেই নাটক লেখা হচ্ছিল।'[৬৯]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই সময় রচনা করেন তিনটি ঐতিহাসিক নাটক—'সিরাজদ্দৌলা' (১৩১২), 'মীরকাসিম' (১৩১৩) এবং 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৩১৪)। এই তিনটি নাটকই

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। গিরিশচন্দ্র এখানে অন্যদের থেকে একটু আলাদা। বঙ্গভঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন যেখানে স্পষ্ট, স্বদেশি আন্দোলনের সময় যেখানে অন্যান্য নাটককাররা ঐতিহাসিক হিন্দু রাজাদেরই জাতীয় বীর হিসেবে দেখছেন তখন গিরিশচন্দ্র দুটি নাটকে মুসলিম নবাবদের মধ্যে জাতীয় বীরের সন্ধান করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচনা করেছেন 'প্রতাপসিংহ' (১৩১২), 'দুর্গাদাস' (১৩১৩), 'মেবারপতন' (১৩১৫)। এখানে লক্ষণীয় যে, তিনটি নাটকের পটভূমিই বাংলা নয়; রাজপুত ও মোগলের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে দেশাত্মবোধ নাটকের বিষয় হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মধ্যে দেশাত্মবোধ যথেষ্ট ছিল। তাঁর 'আর্যগাথা' গ্রন্থে একাধিক দেশাত্মবোধক গান আছে; এছাড়াও স্বদেশীযুগে তাঁর রচিত দেশাত্মবোধক গান যে জনপ্রিয় হয়েছিল সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

ভারতের রাজনীতি : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায়

দীর্ঘ আন্দোলন-বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে অবশেষে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা রদ হয়ে যায়। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে বৈপ্লবিক ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটে তা বিশেষ কিছু শ্রেণির অর্থাৎ উপরতলার মানুষের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রসার লাভ করতে পারেনি।[৭০] সেই প্রসার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির ভারতে আগমনের (১৯১৫) পরেই ঘটে। তিনি সত্যাগ্রহের পথ অবলম্বন করেন।[৭১] এই পথ অবলম্বন করেই তিনি ১৯১৭ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে বিহারের চম্পারণ এবং গুজরাটের আমেদাবাদ ও খেদা অঞ্চলে সত্যাগ্রহের সফল প্রয়োগ করেন। এই প্রথম নির্দিষ্ট অঞ্চলের সাধারণ জনগণের নির্দিষ্ট দাবিদাওয়া নিয়ে কোনো রাজনৈতিক নেতা জনগণের মধ্যে থেকে আন্দোলন করলেন। যা তাঁকে জাতীয় স্তরে জনপ্রিয় করে তোলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতীয়রা আশা করেছিল যথেষ্ট সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার। কিন্তু বিচারক এস. এ. টি. রাওলাট-এর দুটি বিলের উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাসবাদী হিংসা দমনের নামে ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার খর্ব করা।[৭২] সেজন্য এর বিরুদ্ধে গান্ধি রাওলাট সত্যাগ্রহ করেন। সত্যাগ্রহ চলার মাঝেই ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড ঘটে। যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ

করেন। আবার তুরস্কের অসম্মান ও অধিকার খর্ব করার প্রতিবাদে সমগ্র বিশ্বের মতো ভারতেও মার্চ মাসে খিলাফৎ আন্দোলন শুরু হলে গান্ধি সেখানে যোগদান করেন। কারণ এক আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানকে সামিল করার সুযোগ তিনি সেখানে দেখতে পেয়েছিলেন।[৭৩] ব্রিটিশ সরকারের কুশাসন জনগণের মধ্যে ক্ষোভ বাড়িয়ে তোলে। ফলে গান্ধি ১৯২০ সালের ১ আগষ্ট থেকে দেশের সর্বস্তরে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেন। আন্দোলনের মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে দেশের জনগণ সরকারের সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগিতা করবে। এই আন্দোলন সারা দেশে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। সর্বস্তরে স্বদেশি মনোভাব নতুন করে পুনরুজ্জীবিত হল। আন্দোলন দমন করতে ব্রিটিশ সরকারও প্রবল দমননীতি অবলম্বন করে। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনে কিছু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটায় (চৌরিচৌরা হত্যাকাণ্ড) গান্ধি আদর্শচ্যুত হওয়ার অভিযোগে ১৯২২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন এবং ১০ মার্চ তিনি গ্রেপ্তার হন।[৭৪]

১৯২৮ সালে তিনি কারামুক্ত হন। দীর্ঘ এই ছয় বছরে ভারতের রাজনীতিতে অনেক কিছু ঘটেছে। দেশে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য নষ্ট হয়েছে; ফলে একাধিক দাঙ্গা ঘটেছে। অস্পৃশ্য, যাদের গান্ধি 'হরিজন' বলতেন আন্দোলনের প্রত্যাহারে তারাও হতাশ হয়ে পড়েছিল। কারণ আন্দোলনের অপরিহার্য প্রাকশর্ত হিসেবে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের বিষয়টি ছিল। তবে এই সময় বি. আর. আম্বেদকর দলিত জনগণকে সংগঠিত হতে উৎসাহ যোগান। ১৯৩০ সালে নাগপুরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'All Indian Depressed Classes Congress'।[৭৫] অস্পৃশ্যদের অধিকার ও প্রতিনিধিত্ব অর্জনই ছিল এই সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতের রাজনীতিতে দলিত সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার বিষয়টি অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ফলে পরবর্তীতে গান্ধি-আম্বেদকর বিরোধ, পুনাচুক্তি, একাধিক দলিত নেতা ও দলিত সংগঠন তৈরি হয় দলিতদের অধিকার রক্ষা ও প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে। ১৯২০-র দশকের শেষ দিকে শুরু হওয়া বিশ্বব্যাপী মহামন্দা সমস্ত দেশের অর্থনীতির ভিত নাড়িয়ে দেয়। ভারতের কৃষি ও শিল্পে এর তীব্র প্রভাব কৃষক, শ্রমিক, শিল্পপতিদের মনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় 'ইন্ডিয়ান স্ট্যাটুটরি কমিশন' বা 'সাইমন কমিশন' (১৯২৭) পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করে তুলল।

রাজনীতির এই পরিসরে বেশ কিছু দেশাত্মবোধক নাটক রচিত হয়। সেগুলির বিষয়ও পূর্বের নাটকের মতোই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক থেকেছে। বরদাসুন্দর

দাশগুপ্ত বর্ণবিদ্বেষকে কেন্দ্র করে প্রাচীন মিশরের ঐতিহাসিক পটভূমিতে 'মিশরকুমারী' (১৯১৯) নাটক রচনা করেন। শ্বেতাঙ্গ মিশরীয়দের কৃষ্ণাঙ্গ কাফ্রীদের প্রতি বিদ্বেষ নাটকের বিষয়বস্তু। তবে অত্যাচারিত কাফ্রীরা এর প্রতিবাদে যুদ্ধে না গিয়ে অহিংস প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহ করেছে। যা ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধির সংগ্রামের কথা মনে করিয়ে দেয়। অসহযোগ আন্দোলনে জনগণের প্রতি স্বাবলম্বী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সেই সুবাদে বিদেশী পণ্য বয়কট করে চরকার সাহায্যে সুতো কেটে কাপড় বুনার উৎসাহ দেওয়া হয়। সেই চরকা ও খদ্দরের মহিমাকীর্তন হয়েছে মনোমোহন রায়ের 'জীবনযুদ্ধ' (১৯২৪) নাটকে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সমগ্র জীবনচর্যায় সমকালীন চিন্তা বিশেষভাবে ধরা পড়ে। এমন কোনও বিষয় নেই যা তাঁর লেখনী এড়িয়ে গেছে। এই সময় রাজনীতির সর্বগ্রাসী রূপ ভারত তথা বিশ্বের সামনে প্রকাশ্যে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মানবতানাশক রূপ, পুঁজিতন্ত্র ও যন্ত্র সভ্যতার আগ্রাসন, সাম্রাজ্যবাদের প্রকোপ বিশ্বের মানবতাকে প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন কলুষিত দিক এবং ভারতীয়দের অধিকার ও স্বাধীনতার অর্জনের জন্য বহুমুখী সংগ্রাম রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য লেখনীর সঙ্গে নাটকের মধ্যেও ধরা পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেন 'মুক্তধারা' (১৩২৯) নাটকে, 'রক্তকরবী' (১৩৩৩) নাটকে ধরা দিল ধনতন্ত্রী শোষণের বিচিত্র রূপ, সামাজিক শ্রেণিবৈষম্যের কথা উঠে এল 'রথের রশি' (১৩৩০) নাটকে, অস্পৃশ্যতা ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লিখলেন 'চণ্ডালিকা' (১৩৪০) ইত্যাদি। এইসব নাটকগুলি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ভারত তথা বিশ্ব-রাজনীতি চিন্তার ফসল।

১৯২০-এর দশকে বাংলা নাটকের জগতে মন্মথ রায়ের আবির্ভাব। নাটকের মাধ্যমে সমাজসংস্কার ও দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের যে ঐতিহ্য বাংলা নাটক বহন করে আসছিল তিনিও সেই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হতে চেয়েছেন। তবে তিনি প্রথম জীবনে ঐতিহাসিক নাটক রচনায় না গিয়ে সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাকে পৌরাণিক নাটকে প্রকাশ করেন। ঋগ্বেদের দেবতা ও অসুরের সংগ্রামকে ভিত্তি করে রচিত 'দেবাসুর' (১৯২৮) তাঁর প্রথম দেশাত্মবোধক নাটক। নাটককার ১৯২৭-এর পর ভারতের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশে নাটকটি রচনা করেন। ভারতীয় ও ইংরেজদের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের কথা দেবতা ও অসুরের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের মোড়কে পরিবেশিত হয়েছে। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১২ জ্যৈষ্ঠ

আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয়, 'পরাধীন ভারতের মর্মকথা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নাটকের মধ্যে সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।'[৭৬] মন্মথ রায়ের আর একটি দেশাত্মবোধক পৌরাণিক নাটক 'কারাগার' (১৯৩০)। নাটকটির সৃষ্টি সম্পর্কে নাটককার বলেছেন—

> 'দেশে তখন রাজশক্তির বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল। দলে দলে লোক কারাবরণ করছিল। মহাত্মাজীর নির্দেশও ছিল তাই। এই পটভূমিকায় মহাভারতে বর্ণিত কংস কারাগার-এর কথা আমার মনে এসেছিল। যে কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল সেই কারাগারেই—আজ উদিত হবে আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাধীনতার সূর্য।'[৭৭]

১৯৩১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সরকার নাটকটির অভিনয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সে সময়ের বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য আইনবিদ ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে ১৯৩১ সালের মার্চ অধিবেশনে হোম মেম্বার W. D. R. Prentice ঘোষণা করেন—

> 'The Government had prohibited the further performance of the mythological play "Karagar" as it was likely to excite feelings of disaffection towards Government. The home member added that ostensible the play did not relate to present day politics, but actually its being on present day politics was beyond doubt.'[৭৮]

মন্মথ রায়ের পাশাপাশি এই সময় আর একজন নাটককার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা' ও 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে দেশাত্মবোধ স্পষ্ট। তিনিও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের নাটককারদের মতোই দেশাত্মবোধের স্পৃহাকে জাগিয়ে তুলতে ঐতিহাসিক পটভূমিকেই ব্যবহার করেছেন। তবে সে সময়ের নাটকের সঙ্গে এই সব নাটকগুলি কোথায় আলাদা, সে প্রসঙ্গে নাটককারের বক্তব্যই এখানে প্রণিধানযোগ্য—

> 'স্বদেশী যুগের "ছত্রপতি শিবাজী", "সিরাজদ্দৌলা", "মীরকাসিম", "প্রতাপাদিত্য" আর স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিনের "গৈরিকপতাকা", "সিরাজদ্দৌলা", "মীরকাসিম", "বাংলার প্রতাপ" তুলনা করলে দুই যুগের

নাট্যকারদের দৃষ্টিকোণের পার্থক্য উপলব্ধি হবে। পরবর্তীদের নাটকে একটা সংগঠনের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, যা পূর্ববর্তীদের নাটকে পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি । আরো একটা পার্থক্য স্পষ্ট দেখা যাবে। তা হচ্ছে দেশ-প্রেমকে স্বাধীনতা-প্রীতিকে উদীয়মান তরুণ-তরুণীর প্রেমের ও স্বাধীনতা-প্রীতির সঙ্গে এক করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এর পরিচয় "গৈরিকপতাকায়", "কারাগারে", "সিরাজদ্দৌলায়" সুস্পষ্ট পাওয়া যাবে। দেখাবার চেষ্টা হয়েছে যে, স্বদেশ প্রেম ও স্বাধীনতা-প্রীতি ব্যাহত হলে ব্যক্তিগত প্রেম ও প্রীতি পরিপূর্ণতা লাভ করে না।'[৭৯]

মার্কসীয় ভাবধারার প্রসার ও প্রগতি আন্দোলন :

১৯১৭ সালে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব ভারতের রাজনীতির পাশাপাশি সাংস্কৃতির জগতেও গভীরভাবে পড়ে। ১৯৩০-এর দশক থেকে তার প্রকাশ উজ্জ্বল হতে শুরু করে। মুজাফর আহমেদের 'নবযুগ', কাজী নজরুল ইসলামের 'লাঙ্গল' প্রভৃতি সাময়িক পত্র-পত্রিকায় সমাজের নীচুতলার জীবনযন্ত্রণা ও রাশিয়ার বিপ্লবের সদর্থক ভূমিকার কথা তুলে ধরা হতে থাকে। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়া ভ্রমনে গিয়ে, বিপ্লবের পর রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি দেখে তার ভূয়সী প্রশংসা করে রচনা করেছেন 'রাশিয়ার চিঠি'। তবে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় ১৯৩১ সালে প্রকাশিত 'পরিচয়' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে।[৮০] পরবর্তীতে প্রগতি আন্দোলনের মধ্যে এই ভাবধারা আরও প্রগাঢ় হয়।

১৯৩৬ সালের ১০ এপ্রিল 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস খুঁজতে হয় ইউরোপে। তিরিশের দশক থেকেই বিশ্ব রাজনীতিতে পুনরায় উত্তাপ বৃদ্ধি হতে শুরু করে জার্মানিতে হিটলার এবং ইতালিতে মুসোলিনির উত্থানের মধ্য দিয়ে। যা পরিণতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতেই শুরু হয় প্রগতি আন্দোলনের পথ চলা।

ফ্যাসিবাদের এই আগ্রাসনকে ব্যর্থ করতে রম্যাঁ রলাঁ, ম্যাক্সিম গোর্কি, আঁরি বারবুস বিশ্বের মানবতাবাদী প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান জানায় প্রতিরোধ

আন্দোলনে শামিল হতে। সেই সূত্রেই ২১ জুন ১৯৩৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। উক্ত তিন সাহিত্যিক ছাড়াও সেখানে যোগ দেন আঁদ্রে জিদ, আঁদ্রে মারলো, অলডাস হক্সলি, ই. এম. ফর্স্টার, জুলিয়া বাঁদা, মাইকেল গোল্ড, ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্ক, জন স্ট্রাচি প্রমুখ। এখান থেকেই জন্ম নেয় 'International Association of Writers for the Defence of Cultural Against Fascism'। মুলকরাজ আনন্দ-এর 'On the Progressive Writer's Movement' এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চরৈবেতি, চরৈবেতি' প্রবন্ধ থেকে জানতে পারা যায় ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পড়তে যাওয়া কিছু মেধাবী ছাত্র মার্কসবাদে আকৃষ্ট হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সজ্জাদ জহীর , রাজা রাও, ইকবাল সিং, মুহম্মদ আশরফ, মুলকরাজ আনন্দ, ভবানী ভট্টাচার্য, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁরাই ইংল্যাণ্ডে বসে ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম ইস্তেহারটি রচনা করেন। ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে ডেনমার্ক স্ট্রিটের নানকিং রেস্তোরাঁয় এক ঐতিহাসিক জমায়েতে সেই ইস্তেহারটি পাঠ এবং ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের বীজ বপন করা হয়। এই জমায়েতে অবশ্য হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন না, কারণ তিনি ১৯৩৪ সালে দেশে ফিরে গেছেন। কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি এই কাজে জড়িত ও উদ্যোগী ছিলেন। অবশেষে ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে হিন্দি সাহিত্যিক মুন্সী প্রেমচাঁদের সভাপতিত্বে ১০ এপ্রিল 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' (All India Progressive Writer's Association) প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮১] এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন সরোজিনী নাইডু, উর্দু কবি মৌলানা হসরৎ সোহানী প্রমুখ। লণ্ডনে বসে যে ইশতেহারটি তৈরি হয়েছিল সেখানে প্রগতি সাহিত্যের স্বরূপ এবং লক্ষ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৮২] সেগুলি নিম্নরূপ—

১. সাহিত্যে সমাজকে প্রতিফলিত এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা।

২. যে মনোবৃত্তি প্রগতিবিমুখ ও পশ্চাৎগামী তাকে উন্মূলিত করা।

৩. সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ, যৌন স্বৈরাচার, সামাজিক অবিচারের যে ছায়া সাহিত্যে পড়েছে তার অপসারণ ঘটানো।

৪. জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সমস্ত শিল্পের নিবিড় সংযোগস্থাপন। সাহিত্যে উঠে আসবে প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা।

৫. ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার উত্তরাধিকার বহন করা।

৬. দেশকে নবজীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে মৌলিক সাহিত্য রচনার পাশাপাশি ভারতীয় ও বিদেশী উৎস থেকে পাওয়া প্রগতিশীল সমস্ত রচনার অনুবাদ করার কাজে উৎসাহ দান।

৭. বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা—ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পরাঙ্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি।

৮. যা কিছু নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতা সৃষ্টি করে তাকে প্রগতিবিরোধী বলে পরিত্যাগ করা এবং যা কিছু বিচারবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তি সঙ্গতভাবে পরীক্ষা করে তাকে প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করা।

সভাপতির ভাষণে মুন্সী প্রেমচাঁদ বলেন—

> 'The ideal which we want to put before literature today is not that of subjectivism or individualism, for literature does not see the individual as something apart from society, but considers him as a social unit; because his existence is dependent on the society as a whole. Taken apart from society he is a mere cypher and non-entity. It follows, therefore, that those of us who have the good fortune to be educated and who have been endowed with a trained intellect, have certain obligations towards society. Just as we consider the capitalist to be an usurper and an oppressor, because he lives on the labour of others, in the same way we should strongly condemn the 'intellectual capitalist', who, after having received the best

education uses it for his own private ends. It is the duty of our intellectuals to serve society in every possible way. They should acquaint themselves with the general condition of society... We must therefore, raise the cultural level of our writers. I know it is difficult under the present economic system; but let us at least strive after this. If we do not reach the top of mountain, we shall at least raise ourselves from the surface of the earth to a higher place. With love to guide our activities, and with service of humanity as the outward manifestation of this love, there is no difficulty which we cannot overcome. For those who are after wealth and riches there is no place in the temple of love. If we place our services at the disposal of the masses of this country, we shall have done our duty. The happiness which we get from serving humanity and as true artists we should disdain self-advancement and cheap exhibitionism.'[৮৩]

'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' গড়ে ওঠার কিছুদিনের মধ্যেই এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, দিল্লি, লাহোর, বোম্বাই, পুনা, দেহরাদুন, ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি স্থানে এর শাখা সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৮ জুন ১৯৩৬ সালে ম্যাক্সিম গোর্কির জীবনাবসান হয়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কলকাতার অ্যালবার্ট হলে (বর্তমানে কফি হাউস) ১১ জুলাই স্মরণসভা আয়োজন করা হয়। সেই সভা থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ'—যার সভাপতি হন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী হন সম্পাদক।[৮৪]

ভারতের প্রগতি লেখক সংঘ প্রথম থেকেই আন্তর্জাতিক প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখেছিল। সেজন্যই ১৯৩৬ সালে রমাঁ রলাঁ, আঁরি বারবুস পরিচালিত 'World Congress for the Defence of Peace' সম্মেলনে 'নিখিল ভারত প্রগতি

লেখক সংঘ'-এর পক্ষ থেকে মুলকরাজ আনন্দকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হয়। এখান থেকে যে ইশতেহার পাঠানো হয়েছিল তাতে সর্বাগ্রে সাক্ষর করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; এছাড়াও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মুন্সী প্রেমচাঁদ, প্রমথ চৌধুরী, জওহরলাল নেহেরু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, নন্দলাল বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।[৮৫]

২০ নভেম্বর ১৯৩৬ সালে স্পেনে ফ্রাঙ্কোর ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদ আরও প্রবল আকার ধারণ করলে তা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে রম্যাঁ রলাঁ 'মডার্ণ রিভ্যু'-তে ১৯৩৭ সালের জানুয়ারিতে আবেদন জানালে ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহল তাতে সারা দেয়। মার্চ মাসে গড়ে ওঠে 'লীগ আগেইনস্ট ফ্যাসিজম অ্যান্ড ওয়ার'-এর সর্ব-ভারতীয় কমিটি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কমিটির সভাপতি পদ গ্রহণে সম্মত হন।[৮৬]

নানা সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ১৯৩৭ সালে প্রগতি লেখক সংঘ কর্তৃক দুটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ পায়—'Towards Progressive Literature' এবং সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রগতি'। যার মধ্যে প্রগতিশীল সাহিত্যে মার্কসীয় চিন্তার একটি যোগসূত্র স্থাপন করার চেষ্টা লক্ষিত হয়। 'প্রগতি' সংকলন গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এখানে 'মুখবন্ধ'-এ লেখা হয়েছে—

> 'আমরা শুধু বলতে পারি যে যাঁরা এতে লিখেছেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে সামাজিক চৈতন্য সাহিত্য সৃষ্টির পরিপন্থী, তাঁরা মনে করেন যে কোন লেখকই সমাজ সমস্যা সম্বন্ধে নির্বিকার হতে পারেন না। রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তাঁদের পরস্পর মতভেদ আছে বটে, কিন্তু তাঁরা সকলেই ফ্যাসিজমের বিরোধী, ফ্যাসিজম সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে, প্রগতির পথ রুদ্ধ করছে, গণশক্তিকে খর্ব করছে বলে।'[৮৭]

এই সময় 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, মন্মথ সান্যাল, সুবোধ ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য, পুলকেশ দে সরকার তাঁদের লেখালেখির মাধ্যমে প্রগতিশীল আন্দোলনকে সমর্থন ও সহায়তা দান করছিলেন। তাঁদেরই পরিচালিত 'অনামি চক্র' নামক সাহিত্য আসরটি ছিল প্রগতিশীল তথা মার্কসীয় চিন্তা-চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। 'পরিচয় গোষ্ঠী'-এর লেখকরাও, বিশেষ করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল প্রমুখ প্রগতি আন্দোলনের সহায়তাই করেছিল।[৮৮]

'প্রগতি লেখক সংঘ'-র সমর্থন যেমন একদিকে চলছিল, তেমনি এই উদ্যোগের কিছু বিরোধিতাও আসে বিভিন্ন মহল থেকে। যেমন মোহিতলাল মজুমদার ১৯৩৮ সালে প্রগতিবাদী সাহিত্য-চর্চাকে তীক্ষ্ণ আক্রমণ করে লেখেন 'বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক' প্রবন্ধটি। যেখানে তিনি নির্দ্বিধায় বলেন—

> 'সকলকে বাতিল করিয়া দিয়া 'প্রগতি' নামে একটি অনার্য শব্দকে বিশাল বংশদণ্ডে বাঁধদিয়া, ভদ্রবেশী বর্বরদের অগ্রণী হইয়া আধুনিক নগর-চত্বরের পণ্যবিথী প্রকম্পিত করিতে হইবে।'[৮৯]

এছাড়াও 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার মতে প্রগতি লেখক সংঘ একটি বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টির ছদ্মবেশী প্রতিষ্ঠান।[৯০]

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'-এর দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাণী পাঠিয়ে ছিলেন। কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন বাংলার প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনে উৎসাহ যোগায়। সম্মেলনের পরেই কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা 'অগ্রণী' ১৯৩৯ সালের জানুয়ারিতে প্রফুল্ল রায়ের সম্পাদনায় বার হয়।[৯১] এখানে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন মার্কসবাদী তার্কিক লেখালেখি প্রকাশ পায়। যা স্পষ্ট করে সাম্যবাদী সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চাকে।

গণনাট্য সংঘের পশ্চাৎপট ও প্রতিষ্ঠা :

বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভের মধ্যে দিয়ে তিনের দশকের সমাপ্তি ঘটে। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে হিটলারের জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে। পোল্যান্ডকে সাহায্য করতে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স এগিয়ে এলে মানব ইতিহাসের সব থেকে ভয়ঙ্কর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই যুদ্ধের এক পক্ষে থাকে হিটলারের জার্মানি, মুশোলিনির ইটালি এবং তোজোর জাপানের সম্মিলিত জোট 'অক্ষশক্তি'; আর অপর দিকে সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের জোট 'মিত্রশক্তি'। পরে রাশিয়া ও আমেরিকা 'মিত্রশক্তি'-তে যোগদান করে।

ভারতীয় নেতারা প্রথম থেকেই সর্বগ্রাসী নির্মম শাসনতন্ত্র, গোঁড়া জাতিবিদ্বেষ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ফ্যাসিবাদী দর্শনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আবার সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কেও তাঁদের বিদ্বেষ ছিল একই রকম। স্বভাবতই যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর উপর নির্ভরশীল ছিল। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, একটি বিবৃতিতে কংগ্রেস পার্টি স্পষ্ট করে দেয়, যদি সাম্রাজ্যবাদী মিত্রশক্তিগুলি (ইংল্যান্ড, ফ্রান্স) নিজেদের ঔপনিবেশিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য যুদ্ধ করছে এবং প্রতিপক্ষ ফ্যাসিবাদী অক্ষশক্তিগুলির (জার্মানি, ইতালি, জাপান) মধ্যে ঔপনিবেশিক অর্থ-সম্পদলোভী নয়া সাম্রাজ্যবাদই প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে ভারত যুদ্ধ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। আর যদি দেখা যায় পুরনো সাম্রাজ্যবাদী মিত্রশক্তি প্রকৃতই নিজেদের পথ পরিবর্তন করে ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে বিশ্ব গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করতে চায় তাহলে ভারত মিত্রশক্তিকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে।[৯২] কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের কোনও অনুভূতিকে গ্রাহ্য না করে ৩ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ভারতবর্ষকেও যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত প্রগতি লেখক সংঘের তেমন কোনও কার্যকলাপের হদিশ পাওয়া যায় না। এক রকম নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল। 'অগ্রণী' পত্রিকার প্রকাশও এই সময় বন্ধ হয়ে যায়। এই আপাত-শূন্যতাকে সেদিন কিছুটা পূর্ণতা দিয়েছিল একদল বামপন্থী ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত 'ইউথ কালচারাল ইনস্টিটিউট' (ওয়াই. সি. আই.)। সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা করতে ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত একটি কনভেনশনে প্রাথমিকভাবে ওয়াই. সি. আই. গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন নিখিল চক্রবর্তী, চিন্মোহন সোহানবীশ, প্রশান্ত সান্যাল প্রমুখ। ওয়াই. সি. আই.-এর যাত্রা শুরু হয় কলকাতার মিশন রো এক্সটেনশনে কেন্ট হাউসের একটি ঘর ভাড়া নিয়ে। পরে তার দপ্তর গড়ে ওঠে ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটের একটি দোতলা ঘরে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাসান সোরাবর্দি (১৮৯০-১৯৬৫) সভাপতি হন। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, জলি কাউল, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অম্বিকা ঘোষ, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখ। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে

গণচেতনা গড়ে তোলাই ছিল ওয়াই. সি. আই.-এর লক্ষ্য।[৯৩] মূলত নাটক ও গানের চর্চার মাধ্যমে সেই চেষ্টা চালানো হত। নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পের নাট্যরূপ 'অঞ্জনগড়'-এ দেশীয় রাজ্যের নির্মম শোষণ ও অত্যাচারের রূপ দর্শিত হয়েছে। সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'কেরানী' নামে আর একটি বাংলা নাটক পরিচালিত হয়েছিল। জলি কাউল তৎকালীন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় রাজনীতিকে বিষয় করে 'Politicians take to rowing', সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে 'The boy grows up' নাটক দুটি রচনা করেন। দেবব্রত বসু রচনা করেন 'In the heart of China' ও 'Shopkeepers' নাটক দুটি। প্রথমটির বিষয়বস্তু ছিল জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে, লালফৌজের পরিচালনায় চিনা জনসাধারণের প্রতিরোধ এবং দ্বিতীয়টিতে হিটলারের জার্মানিতে ছোট-খাটো দোকানির দুরবস্থা দর্শিত।[৯৪]

১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলারের জার্মানি দ্বারা সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এতদিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' আখ্যা দিয়ে এই যুদ্ধে কোনোরকম সাহায্য না করার কথা প্রচার করেছে। কিন্তু শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হলে তাদের কাছে যুদ্ধের চরিত্র বদলে যায়। সোভিয়েত রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করলে ভারতীয় কমিউনিস্টরা এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে প্রচার করতে শুরু করে। রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পরপরই ২১ জুলাই বাংলার কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা প্রতিষ্ঠা করেন 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। সভাপতি হন ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সম্পাদক হন স্নেহাংসুকান্ত আচার্য ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর পৃষ্ঠপোষক হতে রাজি হয়েছিলেন। এই সমিতির মাধ্যমেই যে প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনে নিষ্ক্রিয়তা দেখা গিয়েছিল তা পুনরায় সক্রিয়তা অর্জন করল। জনসভা, পোস্টার প্রদর্শনী, চলচিত্র, সংগীত পরিচালনার মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে এবং বিশ্বজুড়ে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের কাজ করছিল এই সমিতি।[৯৫]

অল্পকালের মধ্যেই 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'-এর আয়োজনে ঢাকা শহরের সদরঘাটের সন্নিকটে ব্যাপটিস্ট মিশন হলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজ ও সভ্যতার বহুমুখী অগ্রগতির বিষয় তুলে ধরে এক সপ্তাহব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করা হয়। ড.

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করে এর নাম দিয়েছিলেন 'সোভিয়েট মেলা'। এই প্রদর্শনীতে উৎসাহী কর্মীদের মধ্যে ছিলেন তরুণ লেখক সোমেন চন্দ। যিনি জনগণের কাছে চিত্রগুলির ব্যাখ্যা করে দিচ্ছিলেন। প্রদর্শনীর বিপুল সাফল্যের পর স্থির হয়েছিল 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'-এর পক্ষ থেকে ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ঢাকায় একটি ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সোমেন চন্দর নেতৃত্বে একটি মিছিল সেই সম্মেলনে যোগদান করতে গেলে ফ্যাসিস্ট গুন্ডাদের হাতে সোমেন চন্দ পথের মধ্যেই নৃশংসভাবে খুন হন।[৯৬] এই ঘটনা সারা বাংলার শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী মহলে তোলপাড় সৃষ্টি করে। এর প্রতিবাদে ২৮ মার্চ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিউট হলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানেই জন্ম নেয় 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। যার গৃহীত প্রস্তাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় স্বজাতি ও স্বদেশ, শিল্প ও সংস্কৃতিকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার কথা।[৯৭]

এই সময় ভারত তথা বিশ্ব-রাজনীতিতে বেশকিছু ঘটনা ঘটেছে। ইউরোপে হিটলারের জার্মানি পোল্যান্ড, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, নরওয়ে ও ফ্রান্স অধিকার করে রাশিয়ায় গিয়ে পৌঁছেছে, আর এশিয়াতে জাপানের আগ্রাসন ফিলিপাইন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, অতিক্রম করে ১৯৪২ সালের মার্চে রেঙ্গুন দখল করে ভারতের দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত। আগস্ট মাসে বোম্বাই-এ কংগ্রেসের অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফলত দেশব্যাপী যে 'আগস্ট আন্দোলন' শুরু হল তাকে প্রতিহত করতে গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে চলে হিংসাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ। এরকম পরিস্থিতিতেই 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর কাজকর্ম চলে। ফ্যাসিবিরোধী প্রচারের জন্য নাটক ও গানের চর্চার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৪২-এর ১৬ মে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপনে নতুন নাটক চেয়ে পুরস্কার ঘোষণা করে 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে লিখিত নাটকগুলির মধ্যে 'বনস্পতি গুপ্ত' ছদ্মনামে সোমনাথ লাহিড়ীর লেখা 'দেশরক্ষার ডাক' নাটকটি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়।[৯৮] ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে এই সংঘের তিনটি প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়—১৯৪২ সালের ১৯-২০ ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে প্রথম সম্মেলন, ১৯৪৪-এর ১৫-১৭ জানুয়ারি ভারতসভা হলে দ্বিতীয় সম্মেলন এবং ১৯৪৫-এর ২-৮ মার্চ মহম্মদ আলি পার্কে তৃতীয় সম্মেলন। তৃতীয় সম্মেলনে সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে

রাখা হয় 'বঙ্গীয় প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘ'।[৯৯] 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর দ্বিতীয় সম্মেলনের সাত মাস আগে ১৯৪৩ সালের ২২ থেকে ২৫ মে পর্যন্ত বোম্বাই-এ 'সর্ব ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ'-এর চতুর্থ অধিবেশন হয়।[১০০] এই অধিবেশনেই 'All India People's Theatre Association'-এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ২৫ মে IPTA-এর প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের 'ড্রাফট রেজিউলেশন'-এ IPTA-এর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়—

> 'This Conference held under the auspices of Indian People's Theatre Association recognises the urgency of organising a people's theatre movement throughout the whole of India as the means of revitalizing the stage and the traditional arts and making them at ones the expression and organiser of our people's struggle for freedom, cultural progress and economic justice.'[১০১]

বাংলায় 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর নাট্যশাখা আগে থেকেই সক্রিয় ছিল। এর সম্পাদক ছিলেন সুনীল চট্টোপাধ্যায়। IPTA-এর প্রতিষ্ঠার দু'মাসের মাথায় সেই নাট্যশাখার কিছু রদবদল করে গণনাট্য সংঘের কমিটি তৈরি করা হয়। সম্পাদক হন সুধী প্রধান।[১০২]

বাংলা নাটকে ১৩৫০-এর মন্বন্তর, স্বাধীনতা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে বাংলার জনজীবনকে ভোগ করতে হল ১৩৫০ বঙ্গাব্দের (১৯৪৩) ভয়াবহ মন্বন্তর। জাপানি আক্রমণকে প্রতিহত করতে ব্রিটিশ সরকারের গৃহীত 'ডিনায়্যাল পলিসি' এবং 'পোড়ামাটির নীতি' খাদ্য-সংকটকে ঘনিয়ে তুলেছিল। তার উপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেনাদের খাদ্যের জোগান দিতে তারা নির্ভর করেছিল ভারতের মতো উপনিবেশগুলির উপর। এখানকার উৎপাদিত খাদ্য-সম্পদ অধিগ্রহণ করে তা ব্যবহৃত হয়েছে ইউরোপীয় যুদ্ধে লিপ্ত থাকা সেনাদের উদর ভরাতে।[১০৩] এই পরিস্থিতিতে

১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে বিধ্বংসী ঝড়ে মেদিনীপুর ও দুই চব্বিশ পরগনা অঞ্চলে ফসলের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই সময়ের খাদ্যশস্যের অভাবের জন্য সোরাবর্দি সরকারের দেওয়া ১১টি কারণের মধ্যে একটি কারণ ছিল ঝড়।[১০৪] আবার গোদের উপর বিষফোড়ার মতো রূপ নিয়েছিল সেসময়ের কালোবাজারি ও মুনাফাখোরের দল। যেটুকুও খাদ্য-সামগ্রী অবশিষ্ট ছিল তারা সেগুলিও নিজেদের গুদামে মজুত করে বাজারে কৃত্রিমভাবে সংকট ও দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। অমর্ত্য সেন পরবর্তীকালে গবেষণা করে জানিয়েছেন যে, দুর্ভিক্ষ খাদ্যাভাবের ফলে হয়নি, হয়েছে খাদ্যে মানুষের অধিকার না থাকায়।[১০৫] ফলে বাংলায় তৈরি হওয়া এই মন্বন্তরে না খেতে পাওয়া গ্রাম ও শহরতলির জনগণ আসতে থাকে কলকাতায়। যেখানে সেখানে দেখা যায় নিরন্ন জনগণের হাহাকার। উজাড় হয়ে যায় বহু পরিবার, বহু গ্রাম; মারা যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ। অমর্ত্য সেন জানিয়েছেন খাদ্যের অভাবে না খেতে পেয়ে মারা গেছে ৩৫-৪০ লক্ষ মানুষ।[১০৬]

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে জন্মলাভ করে 'গণনাট্য সংঘ' মন্বন্তর ও জাপানের ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকল। প্রথম দিকে গণসংগীত, পরে ছোট ছোট নাটিকার মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলা হল। তবে গণনাট্য সংঘের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার আগেই থেকেই সমসাময়িক সমস্যাকে কেন্দ্র করে নাটক প্রযোজনা হতে শুরু করেছিল। আর গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার পর সেই ধারাতে আরও গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। ১৯৪৩ সালের মে মাসে 'নাট্যভারতী' (পরবর্তীতে গ্রেস সিনেমা) হলে মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' এবং বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটারি' নাটক দুটি অভিনীত হয়। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি' প্রথম অভিনীত হয় স্টার থিয়েটারে ১৯৪৪ সালের ৩ জানুয়ারি। এই প্রেক্ষাপটে রচিত বিজন ভট্টাচার্যের আর একটি নাটক 'জবানবন্দী' (১৯৪৩) সেসময় বিপুল সাড়া ফেলেছিল। এই চারটি নাটকই ১৯৪৩ সালের মধ্যেই 'অরণি' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।[১০৭] এই প্রেক্ষাপটে রচিত আরও কয়েকটি নাটিকা সেসময় বহুবার প্রযোজিত হয়েছিল—যেমন বিনয় রায়ের 'ম্যায় ভুখা হুঁ', পানু পালের 'মহামারীর নৃত্য', এবং নীহার দাশগুপ্তের 'চুয়াল্লিশের বাংলা'। এভাবেই তৈরি হয়েছিল পরবর্তী নাটকের পটভূমি।

আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পটভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্য লিখলেন 'নবান্ন'। ২৪ অক্টোবর ১৯৪৪ সালে 'শ্রীরঙ্গম' (অধুনা বিশ্বরূপা) রঙ্গমঞ্চে নাটকটি প্রথম

অভিনীত হয়। এখান থেকেই বাংলা নাটকের বাঁক পরিবর্তন ঘটে। সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্যাকে পটভূমি করে নাটক রচনার প্রথম প্রয়াস 'নীলদর্পণ' নাটকে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ের নাটককাররা সেই জায়গা থেকে সরে এসে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক রচনায় নিজেদের নিয়োজিত করে। পরবর্তী ক্ষেত্রে সেই স্বর পুনরায় এসে ধ্বনিত হল 'নবান্ন' নাটকে। সমাজের একেবারে নিচের তলার উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত দুঃস্থ কৃষকদের জীবন নিয়ে রচিত এই নাটকে দেখানো হল মন্বন্তরের সামগ্রিক ভয়ানক রূপ। প্রশংসিত হল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি করল বিভিন্ন সমালোচক মহলে। এক কথায় এই নাটকটি বাংলা নাট্যজগতে পালাবদল ঘটিয়েছে। সজল রায়চৌধুরী নাটকটি প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> 'কি প্রযোজনায়—কি অভিনয়ে—কি বিষয়বস্তুতে নবান্ন আগামী দিনের গণনাট্য ও গণতান্ত্রিক নাট্য আন্দোলনের হল পথিকৃৎ। বলা যেতে পারে নবান্ন সূচনা করল এমন এক গতিষ্মান নাট্যকালের, যে কালে গণনাট্য সংঘের তথা গণতান্ত্রিক নাট্যসংস্থাসমূহের ওপরেই নাট্যকর্মের ইতিহাসে মুখ্য ভূমিকার দায়িত্ব বর্তাল। একাত্ম হল গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও নাট্যকর্ম।'[১০৮]

এরপর একে একে মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'দীপশিখা' (১৯৪৪) এবং তুলসী লাহিড়ী 'দুঃখীর ইমান' (১৯৪৪) ও 'ছেঁড়া তার' (১৯৫৩) নাটকগুলি রচনা করেন। এখানে উল্লেখ্য যে 'নবান্ন' নাটকের প্রভাবে বাংলার অপেশাদারি নাট্য আন্দোলনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার ঢেউ এসে লেগেছিল পেশাদারি মঞ্চেও। তারই ফলশ্রুতি ছিল 'দুঃখীর ইমান'। যেটি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরামর্শে রচিত।[১০৯]

১৯৪৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হলে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণ স্বাধীনতার প্রশ্নে পুনরায় সরব হতে শুরু করে। অবশেষে দীর্ঘ সংগ্রাম এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক পদক্ষেপে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট মধ্যরাতে ব্রিটিশদের হাত থেকে দেশের শাসন ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে অর্পিত হয়। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু সেই রাত্রেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন—

> ‘At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we steep out from the old to the new, when an age ends, and when a soul of a nation, long suppressed, find utterance. It is fitting at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity.’[১১০]

তবে এই স্বাধীনতা লাভ দেশের সকল মানুষের কাছে উচ্ছ্বসিত আনন্দ ছিল না। কারণ স্বাধীনতার আনন্দের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এসেছিল দেশভাগের যন্ত্রণা। ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তে পাঞ্জাব প্রদেশ এবং পূর্বপ্রান্তে বাংলা প্রদেশের বুকের ওপর সীমারেখার ছুরি চালিয়ে দুটি দেশ গঠিত হয়—ভারত ও পাকিস্তান। এই দুই প্রান্তে বসবাস করা একটা বড় সংখ্যক জনগণের কাছে তাদের পূর্বপুরুষের দেশ আর তাদের দেশ থাকল না। ফলে দেশ স্বাধীন হল ঠিকই, কিন্তু শুরু হল দীর্ঘমেয়াদি উদ্বাস্তু প্রবাহ। সুতরাং পুরাতন থেকে নতুনের দিকে দেশের অগ্রগতি লক্ষ লক্ষ মানুষকে করে দিল দেশহারা, বাস্তুহারা। যা ছিল স্বাধীন ভারতের সব থেকে বড় মানবতার লজ্জা। এর পিছনে কাজ করেছে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প এবং ক্ষমতা প্রাপ্তির লোভ।

পায়ে হেঁটে, রেলপথে কিংবা জলপথে যে পরিবহন সহজলভ্য ছিল তাতে করেই এই লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুরা নতুন দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা মূলত পশ্চিমবঙ্গের সীমন্ত অঞ্চলগুলিতে প্রবেশ করে উদ্বাস্তুর প্রমাণপত্র হিসেবে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করত। তারা অপেক্ষা করত সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণের।[১১১] তাদেরকে রাখার জন্য বহু জায়গায় গড়ে ওঠে উদ্বাস্তু শিবির। কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশনে গড়ে উঠেছিল একটি বৃহত্তর শিবির। এই শিবিরে তাদের জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। একটি ছোট জায়গাতে থাকত বহু পরিবার। ঐ জায়গাতেই পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে রান্না, খাওয়া, ঘুম, শৌচকর্ম সমস্ত কিছুই করত। চিকিৎসাহীনতা ও নিরাপত্তাহীনতাই ছিল উদ্বাস্তুদের জীবনের অংশ। প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী উদ্বাস্তু শিবিরের

জীবনকে প্রকাশ করতে গিয়ে 'নগ্নতা', 'ক্ষুধা' ও 'মৃত্যু' এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করে তাদের বর্তমান অবস্থার সত্যতা তুলে ধরেছেন।[১১২]

এসব কারণের জন্যই স্বাধীনতার আনন্দে ভারতের বিভিন্ন জায়গার জনগণ উচ্ছ্বসিত হলেও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হতাশাই বোধ করেছিল বেশি। কারণ স্বাধীনতার পূর্বে তারা দেখেছিল ছেচল্লিশের সাপ্রদায়িক দাঙ্গা এবং স্বাধীনতার পরে অনুভব করেছিল দেশভাগের দগদগে ঘা। তাদের কানে নিত্যদিন প্রবেশ করছিল উদ্বাস্তুদের হাহাকার। সেজন্যই পরবর্তীতে বাংলার সাহিত্যিকগণ স্বাধীনতার গৌরবকে নিজেদের সৃষ্টিতে সেভাবে আনলেন না; বদলে তুলে ধরলেন তার অন্ধকারময় দিকগুলিকে। রচিত হল দেশভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে একাধিক কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস। নাটক তার ব্যতিক্রম নয়। নাটকের মধ্যে উঠে আসল উদ্বাস্তু জীবনের অসহায়তা।

দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার পটভূমিতে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭) নাটকটি গণনাট্য সংঘ কর্তৃক অভিনীত হয়। হিন্দু-মুসলমান সর্বদা পরস্পর পরস্পরের শত্রু নয়, বরং তাদের সম্পর্কে সম্প্রীতির দিকও থাকতে পারে—সেই সত্যই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' (১৯৫৩) এবং তুলসী লাহিড়ীর 'বাংলার মাটি' (১৯৫৩) নাটক দুটি সমসময়ে রচিত। এপার বাংলার প্রেক্ষাপটে রচিত 'দলিল' নাটকে ধরা পড়েছে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের জীবন সমস্যা। এই নাটকটি শুধু বাস্তুহারাদের দলিলই নয়, বাঁচার তাগিদে যারা পশ্চিমবঙ্গে এল সেই পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার বীভৎস চেহারাও এখানে ফুটে উঠেছে। আর 'বাংলার মাটি' নাটকের প্রেক্ষাপট হয়েছে পূর্ববঙ্গ। সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের জীবনযন্ত্রণা ধরা পড়েছে। উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে সলিল সেন রচনা করেন 'নতুন ইহুদী' (১৯৫১)। স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গ থেকে দুটি পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে কীভাবে তাদের সর্বস্ব শেষ হয়ে চরম বিপর্যয় ও সীমাহীন হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে তারই এক জ্বলন্ত চিত্র এখানে উঠে এসেছে। এই নাটকে শিবিরে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের প্রতিদিনের যাপন যন্ত্রণা খুব স্পষ্ট।

স্বাধীন ভারতে নাটকের কণ্ঠরোধ :

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা রাজনৈতিক নাটক নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে দেখে নেওয়ার প্রয়োজন স্বাধীন রাষ্ট্র ভারতের সরকারের নাটকে ছাড়পত্র দেওয়ার মনোভাব। পূর্বেই

আলোচনা করেছি পরাধীন ভারতে নাটকের কণ্ঠরোধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৮৭৬ সালে 'নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন' চালু করেছিল। সুতরাং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সমগ্র নাট্যসমাজ আশা করেছিল গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন দেশে অন্তত সে ধরনের কোনও আইন থাকবে না। কিন্তু ১৯৫০ সালে দেখা গেল ভারতীয় সংবিধানে বাক্য ও মতামত প্রকাশের অধিকার দিলেও এই আইনটিকে ভারত সরকার বাতিল করেনি; রেখে দিয়েছিল নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখার স্বার্থেই। ফলে দেশ স্বাধীন হলেও নাট্য ক্ষেত্র ছিল পূর্বের মতোই পরাধীন। ১৯৫৪ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক রায়ে আইনটি সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষিত হলেও তৎকালীন কংগ্রেস সরকার তা বাতিল করতে রাজি হয়নি।[১১৩]

পশ্চিমবঙ্গের নাট্য-জগতে এর প্রকোপ পড়েছে একাধিকবার। কোন নাটক মঞ্চে প্রযোজিত হবে তার ছাড়পত্র দেওয়ার অধিকার থাকে লালবাজার থানার আধিকারিকদের কাছে। এই আইনের বলে ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তরঙ্গ' নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করে; ১৯৫৪-১৯৫৫ পর্যন্ত 'মোকাবিলা' নাটক লালবাজার থানায় আটক করে রাখা হয়; ১৯৫৪ সালে 'পূর্ণগ্রাস' নাটকের সম্পূর্ণ অভিনয়ে কলকাতা পুলিশ আপত্তি জানায়; 'বাংলার মাটি' নাটকের অভিনয়েও পুলিশ বাধ সাধে—কিছু কাটছাঁট করে নাটকটির অভিনয়ে অনুমতি দেয়।[১১৪]

স্বাধীনতার পর গণনাট্য সংঘকে বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথম আক্রমণের ঘটনা ঘটে ১৯৪৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। ২৫ নং ডিকসন লেনে গণনাট্য সংঘের বিশেষ নেতা চারুপ্রকাশ ঘোষের বাড়িতে অনুষ্ঠিত 'দক্ষিণ পূর্ব যুব-ছাত্র সম্মেলন' উপলক্ষে বিদেশী প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা সশস্ত্র আততায়ী সেখানে আক্রমণ করে। তাদের গুলিতে মারা যায় সুশীল মুখার্জী ও ভবদেব ঘোষ।[১১৫] ১৯৪৯ সালের ১৭ জুন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক একটি গোপন সার্কুলার জারি হয়। যেখানে বলা হয়েছিল 'All India People's Theatre Association' ও 'All India Progressive Writers' Association'-এর মতো সংস্থাগুলি নাটক ও গানের মাধ্যমে কমিউনিস্ট 'প্রপাগান্ডা' ছড়াচ্ছে। সেজন্য জনসম্মুখে তাদের অনুষ্ঠানগুলি বন্ধ করতে ১৮৭৬-এর 'নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন' অনুযায়ী জেলা শাসককে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।[১১৬]

১৯৫২ সাল নাগাদ পুলিশ আরও একটু বেশি সক্রিয় হয়ে উঠল। সে সময় স্বাধীনতার স্বরূপ উদঘাটন, সমকালীন সমস্যা এবং সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করে নাটক রচনা হচ্ছে। তা রদ করতে পুলিশ বিভিন্ন নাট্যসংস্থার কাছে পাণ্ডুলিপি চেয়ে পাঠাতে আরম্ভ করে। এক্ষেত্রে যাদের উপর এই সব দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেই সব পুলিশ আধিকারিকদের বেশিরভাগই বাংলা নাটক সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখতেন না। কোনটা নাটকের নাম আর নাটককারের নাম তা তারা জানতেন না। তাই কখনও কখনও তাদের বাধা দেওয়ার ব্যাপার হাস্যকর দেখাত। যেমন একবার গণনাট্যের অফিসে একসঙ্গে 'রক্তকরবী', 'তুলসী লাহিড়ী', 'ছাগল' ইত্যাদি নাটক চেয়ে পাঠালেন এবং দীনবন্ধু মিত্রকে লালবাজারে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। ১৯৫৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি গণনাট্য সংঘের সম্পাদকের কাছে ৫৯ টি নাটকের তালিকা পাঠিয়ে আদেশ দেওয়া হয়, যেন এসব নাটকের পাণ্ডুলিপি থানায় জমা দিয়ে তার অনুমোদন নেওয়া হয়। তার মধ্যে 'নীলদর্পণ', 'মহেশ', 'শহীদের ডাক', 'ছেঁড়া তার', 'বিসর্জন', 'চার অধ্যায়', 'চার্জসীট', 'ভাঙ্গা বন্দর', 'জবানবন্দী' ইত্যাদি নাটক ছিল।[১১৭]

১৯৬২ সালে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মুখ্যমন্ত্রিত্বে কংগ্রেস সরকার 'West Bengal Dramatic Performance Bill-1962' নিয়ে আসেন। ১০ ডিসেম্বর সকলের অবগতির জন্য বিলটি কলকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[১১৮] এই বিলটি ১৮৭৬ এর আইনের থেকেও বেশি কঠোর ছিল। ১৮৭৬-এর আইনে অভিনয়ের উদ্দেশে প্রাক্-অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা সবক্ষেত্রে ছিল না। একমাত্র প্রকাশ্য স্থানে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আয়োজিত নাট্যানুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু ১৯৬২-এর বিলে তা বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রস্তাবিত এই বিলে নাটকের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল তা থেকে যাত্রা, নৃত্য, মূকাভিনয়, ছায়ানাট্য, তরজা, কীর্তন, জলসা, আবৃত্তি কিছুই বাকি ছিল না। অথচ ১৮৭৬-এর আইনে যাত্রা ও ধর্মোৎসব সংক্রান্ত অনুষ্ঠান আইনের আওতার বাইরে ছিল। ১৯৬২-এর বিলে আপত্তিকর অংশ হিসেবে নির্দিষ্ট ছিল—সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা, হিংসা, হত্যা, অশোভনতা, অর্থ আদায়ের জন্য অসদুপায় অবলম্বন ইত্যাদি।[১১৯] অবশেষে সাড়া বাংলার নাট্যজগত, শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের তীব্র বিরোধিতার ও প্রতিবাদের কারণে বিলটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু ১৮৭৬-এর আইনটি থেকেই

যায়। যে আইনের বলে ১৯৬৭ সালে ২৯ জানুয়ারি নিউ এম্পায়ার মঞ্চে জোছন দস্তিদার রচিত ও পরিচালিত 'অমর ভিয়েতনাম' নাটকের মঞ্চায়নে পুলিশ বাধা দেয়।[১২০]

সাতের দশকের আগে পর্যন্ত এভাবেই নাটকের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী শ্রমিক-কৃষক জীবন সমস্যা ও বাংলা নাটক :

স্বাধীনতা লাভের পর রাতারাতি ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়নি। আপামর দেশবাসীর জীবনচিত্র আগের মতোই ছিল। কেবলমাত্র দেশের শাসনকার্য ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে আসে।

স্বাধীনতা পরবর্তীতে কৃষক-জীবনের উন্নতি সাধন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ সরকার ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দবস্ত'-এর ঘোষণার মাধ্যমে বাংলা, বিহার, ওড়িশায় বংশানুক্রমিকভাবে একদল জমিদার-জায়গিরদার-তালুকদারের সৃষ্টি করে। তারাই হয়ে ওঠে সমস্ত জমির মালিক এবং কৃষকরা সেই জমিতে দাসের ন্যায় চাষ করে। প্রতিষ্ঠিত হয় এক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় প্রভু জমিদার ও দাস কৃষকের মধ্যে এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে। ফলে জমিদারের আধিপত্য এবং কৃষকের প্রতিরোধ—এই দুটি পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ইতিহাস এগিয়ে চলে। যে ইতিহাস কেবলমাত্র শাসক জমিদারই রচনা করে না, শোষিত কৃষকও ইতিহাসের নিয়ন্তা হয়ে থাকে।[১২১] এই কারণেই ব্রিটিশ-ভারতে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহের মতো একাধিক কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে কৃষকরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ তারা মনে করেছিল দেশ স্বাধীন হলে তারাও এই শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু তারপরও জমিদারের হাত থেকে সহজে কৃষকরা মুক্তি পায়নি। সরকার অবশ্য কৃষকদের মানোন্নয়নের স্বার্থে কিছু আইন প্রণয়ন করেন—যেমন 'পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার আইন' (১৯৫০), 'জমিদারি অধিগ্রহণ আইন' (১৯৫৩), 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার আইন' (১৯৫৫)। কিন্তু এসব আইন সত্ত্বেও জমিদাররা নিজেদের জমি ছাড়ত না। সরকারি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজেদের সমস্ত জমি বেনামে তারা ভোগ করত। নিজেদের পরিবারের সদস্যদের নামে জমি রেখে, কাল্পনিক প্রজা বানিয়ে তার নামে জমি রেখে অথবা জমিকে দেবোত্তর সম্পত্তি করে জমিদাররা নিজেদের দখলে জমি রাখত।[১২২] আবার

উল্টোদিকে কৃষকদের ভাগ্যে জুটত উচ্ছেদ। ফলে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ক্রমশ সঙ্গিন হয়ে পড়ে। তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্বাধীনতার পর একাধিক কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়—যা সর্বোচ্চ রূপ নেয় নকশাল আন্দোলনে।

কৃষকদের অধিকার রক্ষার স্বার্থে বাংলা নাটককাররাও এগিয়ে আসেন। কৃষক জীবনের যাবতীয় সমস্যা ও সংকট এবং তা প্রতিরোধে তাদের সংগ্রাম বাংলা নাটকের বিষয় হতে শুরু করে। তবে ছয়ের দশকে কৃষক আন্দোলন নিয়ে সব থেকে বেশি নাটক রচিত হয়েছে। এর পিছনে কাজ করেছে পশ্চিমবঙ্গের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবস্থা, দেশীয় ক্ষেত্রে অর্থনীতির তীব্র সংকট, খাদ্যের অভাব এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব বৃদ্ধি। ফলে এই দশকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের আন্দোলন কলকারখানার শ্রমিক থেকে শুরু করে কৃষক-জীবনেও ঢেউ তোলে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে কৃষক সমস্যা নিয়ে রচিত উল্লেখযোগ্য কিছু নাটক হল চিররঞ্জন দাসের 'সমুদ্রের ঢেউ', 'বাধা আর মানব না', 'উজান', 'পদক্ষেপ', সুনীল দত্তের 'রক্তে বোনা ধান', 'মুক্তির স্বাদ', 'বারুদ', মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আমার মাটি', 'জননী', 'ভাঙা কাস্তের গান', শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মহত্যা আইনী কর', 'অন্নপূর্ণার দেশে', 'কালের পালা', বাসুদেব বসুর 'জীবন জয়ের গান', 'জোয়ার', শিব শর্মার 'মরা গাঙে বান', রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'রক্তে রোয়া ধান', নব কুমার ভট্টাচার্যের 'জোট বাঁধো তৈরি হও', 'নতুন দিনের ভোরে', উৎপল দত্তের 'কাকদ্বীপের মা', শ্রীজীব গোস্বামীর 'শান দেওয়া কাস্তে', 'রক্ত গোলাপ', পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘরে তোল ধান', বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' ইত্যাদি।

কৃষক-জীবনের পাশাপাশি শ্রমিক জীবন ও শ্রমিক আন্দোলনও বাংলা নাটকে বিশেষ জায়গা করে নেয়। স্বাধীনতা লাভের পর মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, শ্রমিকশ্রেণির মজুরির অবক্ষয় শ্রমিকদের জীবনযাত্রাকে তলানিতে নিয়ে যেতে থাকে। ফলে ক্রমশ বাড়তে থাকে শ্রমিক-অসন্তোষ। ১৯৫০ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত এই বারো বছরে ৩০ শতাংশ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল; আর শ্রমিকদের আয় বেড়েছিল মাত্র ১০ শতাংশ। অথচ শিল্পে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩০ শতাংশ।[১২৩] আবার সেই সঙ্গে ছিল শ্রমিক ছাঁটাই-এর সমস্যা। ফলে উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির সুফল লাভ করেছিল শিল্পপতি, বৃহৎ ব্যবসায়ী ও সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণি। স্বভাবতই শ্রমিকশ্রেণিকে নিজেদের জীবনের মানোন্নয়ন করতে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলা ছিল আবশ্যক। ফলে শিল্প ধর্মঘট,

সাধারণ ধর্মঘট, মিছিল, সমাবেশের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫১ থেকে ১৯৬২ এই বারো বছরে সারা ভারতে মোট ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ৪২,৫৮৬ এবং বিনষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা ছিল প্রায় ছয় কোটি চল্লিশ।[১২৪]

শ্রমিকদের এই জাতীয় সমস্যা ও সংগ্রাম নিয়ে বেশকিছু নাটক রচিত হয়। শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙতে ছড়ানো হত সাম্প্রদায়িকতার বিষ। সেই পটভূমিতে মন্মথ রায়ের 'ধর্মঘট' (১৯৫৩) এবং দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মশাল' (১৯৫৪) নাটক দুটি রচিত। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোকাবিলা' (১৯৫০) নাটকে মধ্যবিত্ত জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে শ্রমিক-জীবনও উঠে এসেছে। হিন্দমোটর ধর্মঘটের প্রেক্ষাপটে উৎপল দত্ত 'স্পেশাল ট্রেন' পথনাটক লেখেন এবং কয়লা খাদের মধ্যে কর্মরত শ্রমিক জীবন ধরা দিল 'অঙ্গার' (১৯৫৯) নাটকে। এছাড়াও মণীন্দ্র মজুমদারের 'মৃত্যু নেই' (১৯৪৯), অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দ্বান্দ্বিক', অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আজকের উত্তর' নাটকগুলি শ্রমিকশ্রেণির জীবন কেন্দ্রিক।

বাংলা নাটকে আন্তর্জাতিক কণ্ঠস্বর :

স্বাধীনতার পূর্বে বাংলা নাটকে দেশীয় সমস্যা ও সংকটই প্রধানত ধরা পড়েছে। বাইরের কোনও দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট বা বিদেশী কোনও জাতির প্রবঞ্চিত জীবনচরিত্র বাংলা নাটকে তেমন উঠে আসেনি। একমাত্র বরদাসুন্দর দাশগুপ্ত প্রাচীন মিশরের বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে 'মিশরকুমারী' নাটক রচনা করেছিলেন; এছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামের সময় আন্তর্জাতিকতা বাংলা নাটকে ধরা পড়েছিল দেশীয় প্রেক্ষিতে। তবে স্বাধীনতা লাভের পর—বিশেষ করে ছয়ের দশক থেকে বাংলা নাটকে ও নাট্যমঞ্চে বিষয় হিসেবে আসতে থাকল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জটিলতা। এ ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ভূমিকা নিয়েছিল অপেশাদারি ও গ্রুপ থিয়েটারগুলি। বিশ্বের কোনও দেশ বা কোনও জাতি যদি অন্য কোনও দেশ বা জাতির সাম্রাজ্যবাদিতার কারণে নিপীড়িত বা অবদমিত হয়েছে তখনই বাংলার নাট্যকাররা সোচ্চার হয়েছে। এর পিছনে অবশ্য কাজ করেছে দীর্ঘ দিনের পরাধীনতার গ্লানি এবং বহিঃশত্রু দ্বারা শোষণ। ফলে যখনই বিশ্বের

কোনও দেশের সামনে সেরকম পরিস্থিতি উদয় হয়েছে তখনই এদেশীয় নাটককাররা নিজেদের আত্মিক যোগাযোগ খুঁজে পেয়েছেন।

দীর্ঘ দিন ধরে ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম ও ব্রিটিশদের হাতে পরাধীন থাকা আফ্রিকা মহাদেশের ১৭টি দেশ ছয়ের দশক জুড়ে প্রবল আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়। সেই সব দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্স শাসিত ক্যামেরুন, টোগো, মালি, মাদাগাস্কার, ডাহোমি (বেনিন), আইভরি কোস্ট, বুর্কিনা ফাসো, চাদ, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র; ব্রিটিশ শাসিত সোমালিয়া ও নাইজেরিয়া; বেলজিয়াম শাসিত কঙ্গো ইত্যাদি দেশ ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তি পায়।[১২৫] তাদের সেই মুক্তি সংগ্রাম উপস্থিত হল কালীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর 'অমর আফ্রিকা', উৎপল দত্তের 'কঙ্গোর কারাগার', শ্যামলতনু দাসগুপ্তের 'রক্তাক্ত রোডেশিয়া' নাটকে।

ছয়ের দশকে বাংলা নাট্যক্ষেত্রে সব থেকে বেশি সাড়া জাগিয়েছিল ভিয়েতনামের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধ। চিন সীমান্তে অবস্থিত ভিয়েতনামে ক্রমশ কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের প্রভাব বাড়তে শুরু করলে পুঁজিবাদী আমেরিকার মাথাব্যথা শুরু হয়। ফলে ১৯৬০-এর পর থেকেই আমেরিকা ভিয়েতনামের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার নামে সেখানে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করার পরিকল্পনা আঁটে। কারণ ভিয়েতনামকে দখল করতে পারলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার নজরদারি চালাতে সুবিধা হবে। ফলে ১৯৬৫ সাল থেকে শুরু হয় আমেরিকা ও ভিয়েতনামের মধ্যে যুদ্ধ। যার ব্যাপ্তি ছিল দীর্ঘ দশ বছর ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত। ভিয়েতনামের গেরিলা জনসেনাদের প্রবল যুদ্ধ, বাইরে থেকে রাশিয়া, চিন-এর মতো কমিউনিস্ট দেশের সমর্থন এবং ভিয়েতনামের ভৌগোলিক পরিবেশ আমেরিকাকে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করে। আমেরিকার এই ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব সারা বিশ্বে প্রবলভাবে নিন্দিত ও সমালোচিত হয়। আমেরিকা-ভিয়েতনামের এই যুদ্ধ বাংলা নাটককার মহলে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। লেখা হয় একগুচ্ছ নাটক। যেগুলিতে ধরা পড়েছে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী চেহারা, ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষের মরণপণ সংগ্রাম। তার মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য নাটক হল—উৎপল দত্তর 'অজেয় ভিয়েতনাম' (১৯৬৬), সুনীল দত্তর 'মুক্তি যোদ্ধা', চিররঞ্জন দাসের 'ভিয়েত নাম', নেপাল ঘোষের 'দেশে দেশে', জোছন দস্তিদারের 'অমর ভিয়েতনাম', শুভঙ্কর চক্রবর্তীর 'আমরা

কবরে যাব না' (১৯৭১), অমল রায়ের 'পাতা নড়ার শব্দ' (১৯৭১), কাজল দাসের 'ভিয়েতনাম ক্যাম্পোসিনো' (১৯৭৫) ইত্যাদি।

নির্বাচন কেন্দ্রিক নাটক :

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এক ধরনের প্রচার মূলক নাটক রচনার ঝোঁক লক্ষ করা যায়। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের নির্বাচনী প্রচারে নাট্যমঞ্চকে ব্যবহার করে। এই সমস্ত নাটকে বিভিন্ন পার্টির রাজনৈতিক এজেন্ডাগুলি স্থান পেত। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের (১৯৫২) সময় প্রদীপ মুখোপাধ্যায় 'একদা ১৯৫২', পানু পাল 'ভোটের ভেট' নাটক রচনা করেছিলেন। 'ভোটের ভেট' বিশেষ সাড়া ফেলেছিল। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে (১৯৫৭) নির্মল ঘোষ 'ভোকাট্টা', পানু পাল 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব', উৎপল দত্ত 'সমাজতন্ত্র', বীরু মুখোপাধ্যায় 'লম্বকর্ম', কালীপ্রসাদ রায় চৌধুরী 'ভোট পাঁচালী'; ১৯৬২-এর নির্বাচন উপলক্ষ্যে উৎপল দত্ত 'স্পেশাল ট্রেন'; ১৯৬৭-এর নির্বাচনে উৎপল দত্ত 'দিন বদলের পালা', বীরু মুখোপাধ্যায় 'জন্মোৎসব', হীরেন ভট্টাচার্য 'বাস্তব শাস্ত্র', শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায় 'মুদ্রামুক্তি'; ১৯৭১-এর নির্বাচনে চিররঞ্জন দাস 'পথে নামার সময়', সলিল বিকাশ নাথ 'বেসরকারী সূত্রে', শ্রীজীব গোস্বামী 'শান দেওয়া কাস্তে', পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঘরে তোল ধান'; ১৯৭৭-এর নির্বাচনে 'দিন বদলের দ্বিতীয় পালা', 'জনতার কল্লোল' ইত্যাদি নাটকগুলি রচনা ও পরিচালনা করেন।

পোস্টার নাটক :

নির্বাচন ছাড়াও স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় অবলম্বন করে এক ধরনের ছোট ছোট নাটিকা রচনা হয়েছে। পোস্টারে যেমন অল্প কয়েকটি শব্দের খরচে কোনও বক্তব্য পেশ করা হয়, ঠিক সেরকমই খুব কম চরিত্র এবং নামমাত্র উপকরণ নিয়ে উদ্দেশ্যমূলক বক্তব্য প্রকাশ করে এক ধরনের নাটিকা রচনা হয়েছে। এই সব নাটককে পোস্টার নাটক বলা হয়ে থাকে। যেহেতু নির্দিষ্ট বিষয় প্রচারই এই সব নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য সেহেতু এই নাটকগুলিকে প্রচার নাটকও বলা হয়। আবার এই নাটকের অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট কোনও মঞ্চের প্রয়োজন হয় না, যত্রতত্র পথেঘাটে এই নাটকগুলি যে কোনও সময়

অভিনয় হতে পারে। সেজন্য এগুলিকে পথ-নাটক বলেও চিহ্নিত করা হয়। এই সমস্ত নাটকে মূলত সমসাময়িক বিষয়ই স্থান পায়। যেমন উমানাথ ভট্টাচার্যের 'চার্জশীট' (১৯৫১) বন্দিমুক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত, উৎপল দত্তের 'স্পেশাল ট্রেন' (১৯৬১) হিন্দমোটর কারখানায় ধর্মঘটিদের উপর পুলিশের অত্যাচার নিয়ে লেখা এবং 'বর্গী এল দেশে' নাটকে মস্তানি সন্ত্রাসের চিত্র ফুটে উঠেছে, শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মিছিল'-এ ১৯৫৯-এর খাদ্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শোধনবাদী চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে, বারীন রায়ের 'আর কতদিন' খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত, সলিল বিকাশ নাথের 'বেসরকারি সূত্র'-এর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বিষয় হয়েছে, চিররঞ্জন দাসের 'পথে নামার সময়'-এ পুলিশি সন্ত্রাস ও মস্তানের অত্যাচার দেখানো হয়েছে, শ্রীজীব গোস্বামীর 'মেঘ কাটার পালা' এবং পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘরে তোল ধান' কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা ইত্যাদি।

উৎপল দত্তের 'বিপ্লবী থিয়েটার'-এর রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা:

উৎপল দত্ত মনে করেন রাজনৈতিক নাটকের সফলতা আসে হাজার হাজার শ্রমক্লান্ত মানুষের মাঝে অভিনয় করলে; ক্ষুদ্র প্রেক্ষাগৃহে মুষ্টিমেয় ভদ্রলোকের সামনে অভিনয়ের মধ্যে নয়।[১২৬] কারণ রাজনৈতিক নাটকের উদ্দেশ্য নীচের মহলে রাজনীতির প্রসার করা। তাঁর এই নাট্যচিন্তা সম্পূর্ণরূপে মার্কসীয় বীক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব হয়েছে নাটকের প্রধান চালিকাশক্তি। নাট্যশিল্পকে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয় এই দুটি ভাগ করে তিনি সর্বদা প্রলেতারিয় শ্রেণিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাদের একজন হয়েই সমাজকে দেখেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন শোষণের বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন লেখালেখি, সাক্ষাৎকারের মাধ্যে তিনি নিজ রাজনৈতিক নাট্যচিন্তার স্বরূপটি তুলে ধরেছেন।

রাজনৈতিক থিয়েটার যারা অনুশীলন করবে তাদের প্রবলভাবে নিরীশ্বরবাদী হতে হবে। দিদেরোর প্রসঙ্গ টেনে উৎপল দত্ত বলেছেন—

> 'যতই পড়াশুনা করুক, প্রত্যেক পাতি-বুর্জোয়া মগজেই ঘাঁটি গেড়ে থাকে ধর্মীয় বিশ্বাসের বহুবিধ অবশেষ। নিজের ঈশ্বরবিশ্বাসে ঘা দিতে পারলে,

তবেই কেউ শাসক শ্রেণীর প্রতি তার বিশ্বাসে সত্যিসত্যি ঝাঁকি দিতে সমর্থ হয়।'[১২৭]

তবে রাজনৈতিক থিয়েটার সরাসরি দর্শকদের ধর্মীয় বিশ্বাসে ঘা দেবে না। কারণ এই থিয়েটারের প্রকৃত উদ্দেশ্য দর্শক মনে শ্রেণি-ঘৃণা উদ্রেক করা, ক্রোধ জাগিয়ে তোলা, সংগ্রামী স্পৃহাকে উসকে দেওয়া। সেখানে ধর্ম কোনও বাধা নয়। লড়াই শুরুর আগে জনগণকে ধর্ম ত্যাগ করতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ একজন ধর্মশীল ব্যক্তিও সংগ্রামের প্রথম সারিতে থাকতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক থিয়েটার কর্মীদের সেই স্বাধীনতা থাকতে পারে না। কারণ ধর্মের প্রতি তার আস্থা না থাকলে তবেই সে উপলব্ধি করতে পারবে জনগণের প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের অশুভ প্রভাবকে; হৃদয়াঙ্গম করতে পারবে ইতিহাস ও চরিত্রকে। 'ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এক দীর্ঘস্থায়ী ও শ্রমসাধ্য কাজ, যা হয়তো একশ বছরও গড়িয়ে যেতে পারে, এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে এখনই তার কোনও প্রাসঙ্গিকতাও নেই।'[১২৮]

উৎপল দত্তের নাটকের ওপর আনিত বহু অভিযোগের মধ্যে একটি অন্যতম অভিযোগ, বিশেষ রাজনীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো, সত্যকে চেপে যাওয়া। যেমন 'কল্লোল' নাটকে ব্রিটিশ বোমারু বিমানের আক্রমণ সত্ত্বেও 'খাইবার' যুদ্ধজাহাজ আত্মসমর্পণ করেনি—এই ঘটনা অনৈতিহাসিক অথবা 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকের শেষে শ্রমিকরা গুন্ডাদের আক্রমণ করে—এই ঘটনার কোনও সত্যতা নেই। এর উত্তর দিতে গিয়ে নাটককার জানিয়েছেন সত্য সর্বদাই হয়ে থাকে শ্রেণিসত্য। প্রতিটি তথ্যের সঙ্গে দুটি সত্য জড়িত—বুর্জোয়াদের সত্য ও প্রলেতারিয়দের সত্য।[১২৯] বুর্জোয়াদের কাছে যেটি সত্য বলে প্রতিভাত, প্রলেতারিয়দের কাছে সেটি হয় মিথ্যা অথবা এর উলটোটা। শ্রেণি-নিরপেক্ষ, আধিবিদ্যক, শাশ্বত ও পরম সত্যে রাজনৈতিক নাটকের কোনও আস্থা নেই। এই ধরনের সত্য অন্তিমে বুর্জোয়া শ্রেণিরই কাজে লাগে। কারণ শ্রেণিসংগ্রাম কখনও মধ্যস্থতা বরদাস্ত করে না; তার আসল উদ্দেশ্যই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রেণিকে ক্ষমতাচ্যুত করা। রাজনৈতিক থিয়েটার কখনও পক্ষপাতশূন্য হয় না এবং বিপ্লবী থিয়েটার সর্বদা শোষিতদের পাশে থাকে, তাদের বিপ্লবে উৎসাহ দেয়। যেহেতু ধনতান্ত্রিক যুগে বুর্জোয়া শ্রেণি দ্বারা প্রলেতারিয় শ্রেণি শোষিত সেহেতু প্রলেতারিয় সত্যকে গ্রহণ করাই রাজনৈতিক থিয়েটারের প্রধান শর্ত।[১৩০] বুর্জোয়ারা বাধ্য করে যা ঘটেছে সেটাই

দেখাতে—এটি আসলে বুর্জোয়া বাস্তববাদের দাবি। বুর্জোয়ারা চায় পুঁজিবাদকে শাশ্বত করতে। আর জগৎ যে নিত্য পরিবর্তনশীল তা বুর্জোয়ারা ভালোভাবেই জানে—যেহেতু তারাও একদিন জগদ্দল সামন্ততন্ত্রকে ভেঙেই ক্ষমতায় এসেছিল। তাই জগতের এই পরিবর্তনশীল চরিত্র সম্পর্কে প্রলেতারিয় শক্তি কখনও অবগত হোক তা তারা চায় না। কারণ তাহলে পুঁজিবাদও একদিন অপসৃত হতে পারে। সেজন্যই তারা নিজেদের সাহিত্যে যা ঘটেছে তার বেশি দেখাতে চায় না। 'একটা উচ্ছিন্ন চাষিকে উচ্ছিন্ন হিসেবেই দেখাও, এই হচ্ছে বুর্জোয়াদের কথা। সেই চাষির মধ্যে যে একজন যোদ্ধাও বাস করে একথা ঘুণাক্ষরেও বোলো না।'[১৩১] কিন্তু ম্যাক্সিম গোর্কি এবং বের্টোল্ট ব্রেখট জোর দিয়েছেন ভবিষ্যতে যা ঘটবে, যা ঘটা উচিত তার ওপর।[১৩২] কারণ—

> 'বিপ্লবী বাস্তববাদ জীবনের ফটোগ্রাফ উপস্থিত করে না, জীবনকে অনুকরণ করে না। তার দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক। সে জীবনকে ধরে তার গতির মধ্যে, তার অনিবার্য ভবিষ্যৎ-সহ।...রাজনৈতিক নাটক শেষ যবনিকায় শেষ হয় না, একটা অসমাপ্তির রেশ থেকে যায়। কারণ ইতিহাসের সমাপ্তি নেই।'[১৩৩]

ভারতীয় শাসকের ইতিহাস চর্চার মধ্যে যে শান্তি ও অহিংসার বাণীকে জাতীয় ঐতিহ্য বলে প্রচার করা হয়েছে তা আসলে 'জনগণকে আচ্ছন্ন রাখার জন্য শাসক শ্রেণীর সুচতুর কৌশল'।[১৩৪] এই সব ধ্যান-ধারণা শাসকশ্রেণির দ্বারা 'চিরন্তন ভারতীয় মূল্যবোধ' বলে সমাজে চালিত। এগুলি সম্পর্কে উৎপল দত্ত মন্তব্য করেছেন—

> '...গোটা পৃথিবী থেকে জড়ো হওয়া এক জাতীয় বিশৃঙ্খল ধারণা যা শোষণ ও লুঠতরাজকে ন্যায্য বলে সমর্থন করে, যা শাসক শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখে এবং যা শাসিতদের চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে পারে।'[১৩৫]

ভারতের ইতিহাসের এমন কোনও পর্যায় নেই যেখানে শোষিত শ্রেণির রক্তাক্ত সংগ্রামের ঘটনা নেই। এমনকি প্রাচীনকালে 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা'-র বাণীতেও ন্যায়যুদ্ধের বার্তাই প্রচারিত।[১৩৬] এছাড়াও শুধু ব্রিটিশ আমলের পর্যায় ধরলেই প্রায় প্রত্যেকটা দশকেই একাধিক রক্তাক্ত সংগ্রামের ঘটনা নজরে আসে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অন্যান্য সশস্ত্র সংগ্রামকে খাটো করে মহাত্মা গান্ধির প্রচারিত অহিংসা ও শান্তির ওপর ভিত্তি করে গঠিত বিভিন্ন আন্দোলনের ভূমিকাকে দেশের শাসকবর্গ যেভাবে বড় করে দেখিয়েছে এবং

গান্ধিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান নায়ক হিসেবে তুলে ধরেছে—সেই ভ্রান্ত ইতিহাসকে খণ্ডন করা বিপ্লবী থিয়েটারের অন্যতম কাজ। সেই সঙ্গে ভারতের সহিংস সংগ্রামের ইতিহাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, জনগণের সংগ্রামী ঐতিহ্যের প্রচার করা, সশস্ত্র বিপ্লবী ও শহীদদের বীরত্বের গাথা বারবার স্মরণ করা।[১৩৭]

'বিপ্লবী থিয়েটার' রাজনৈতিক নাট্যচিন্তার মূল উদ্দেশ্যই হল প্রলেতারিয় জনগণকে শ্রেণিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা। নাটককার নিজের সম্পর্কেও বিশদে বলেছেন—

> 'আমি পার্টিজান, নিরপেক্ষ নই; বিশ্বাস করি রাজনৈতিক সংগ্রামে। যেদিন আমি রাজনৈতিক সংগ্রামে যোগ দেওয়া বন্ধ করব, সেদিন শিল্পী হিসেবেও মৃত্যু হবে আমার।'[১৩৮]

এখানে প্রশ্ন ওঠে তাহলে কি উৎপল দত্তের এই চিন্তা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত? তাহলে শিল্পীর স্বাধীনতা কোথায়?

উৎপল দত্ত পার্টির থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন রাজনৈতিক লাইনকে। কারণ পার্টি কোনও নির্দেশ দেয় না, দেয় তার রাজনৈতিক লাইন। সেই লাইনকে সাংস্কৃতিক জগতে প্রয়োগ করার কাজ নাট্যদলগুলির। কারণ সেই লাইন অনুসরণ না করলে নাটককে শ্রেণিসংগ্রামে যুক্ত করা যাবে না। শ্রেণিসংগ্রাম যারা করছে, যারা তার নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নাটককে কাজ করতে হবে। নাহলে শ্রেণিসংগ্রামের বুনিয়াদি সমস্যাগুলি থেকে নাটক ও নাটককার বিয়োজিত হয়ে পড়বে। এখানেই গুরুত্ব পার্টির। পার্টি সেই বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে জনতার সঙ্গে যোগাযোগ এবং সংগ্রামের সঙ্গে পরিচিত করাতে পারে।[১৩৯] তাহলে পার্টির বিচ্যুতি ঘটলে তো নাটকও বিপথগামী হতে পারে! আসলে কমিউনিস্ট আন্দোলন সারা বিশ্বে চলছে। পার্টির ইতিহাস দীর্ঘ ও বিশ্বব্যাপী। সামগ্রিকভাবে তা ভুল পথে যেতে পারে না। শ্রেণিসংগ্রামের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে তার বিচ্যুতি ঘটতেই পারে, কিন্তু পার্টির বাইরে বা বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কোনো সঠিক কাজ হতে পারে না।

রাজনৈতিক থিয়েটার চরিত্রের অতি-সরলীকরণ করে না, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার ওপর চরিত্র সৃষ্টি করে। সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে চরিত্রের বিযুক্তিকরণ করা যাবে না। একজন দুরাচারী পুঁজিপতি ও একজন শ্রমিক-নায়ককে সমাজদ্বন্দ্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত

করতে হবে। তাদের চারিত্রিক গুণের সঙ্গে মানসদ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলতে হবে। নাহলে চরিত্রগুলি পুতুলে পরিণত হবে। মার্কসের প্রসঙ্গ টেনে উৎপল দত্ত বলেছেন—

> 'মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে প্রকৃতিতে চরম সাদা এবং চরম কালো বলে কিছু নেই। এবং অপরিবর্তনীয়ও কিছু নেই। একজন অপরিবর্তনীয় নায়ক বা খলনায়ক অসম্ভব।'[১৪০]

বিপ্লবের প্রচার করা, বুর্জোয়া সামন্তবাদী শক্তিকে উচ্ছেদ করা বিপ্লবী থিয়েটারের মূল লক্ষ্য। যারা বিপ্লবী থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে তাদের জানতে হবে বর্তমানে দেশে বিপ্লব কোন স্তরে আছে, শ্রেণিসংগ্রামের অবস্থা কীরূপ। ওয়াকিবহাল থাকতে হবে প্রলেতারিয়েতদের দাবিগুলি সম্পর্কে। সেসব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নাটক রচনা করলে তাতে কেবল দার্শনিক প্রত্যয় ধরা পড়বে। শহুরে কিছু বুদ্ধিজীবীদের তা আকর্ষণ করলেও যাদের জন্য নাটক রচনা সেই বিপ্লবী শ্রেণির কাছে তা নির্জীব ও দুর্জ্ঞেয় প্রতিভাত হবে।[১৪১]

বাদল সরকারের 'থার্ড থিয়েটার'-এর রাজনীতিচিন্তা :

বাদল সরকার ছয়ের দশকের শেষ প্রান্তে এসে প্রসেনিয়াম থিয়েটার থেকে সরে 'বিকল্প থিয়েটার'-এর কথা চিন্তা করেন। তৈরি করেন 'থার্ড থিয়েটার' বা 'তৃতীয় থিয়েটার'। এরপর বাকি জীবন কাটিয়েছেন এই বিকল্প থিয়েটারের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। এই বিকল্প থিয়েটার নির্মাণের কারণ ছিল রাজনৈতিক। বর্তমান সময়ে দেশের অগ্রগতিতে যে সমস্ত শূন্যস্থানগুলি আছে তার সন্ধান এবং নাট্যরূপায়ণের মাধ্যমে আপামর জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। তিনি নাটকে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলিকে তুলে এনেছেন এবং অধিক সংখ্যক জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। কারণ তিনি মনে করতেন-

> 'তৃতীয় থিয়েটারের প্রাণ হচ্ছে সমাজকে পরিবর্তিত করার তাগিদ এবং সমাজের পরিবর্তন সম্ভব নয় যদি মানুষের পরিবর্তন না ঘটে, মানুষের চিন্তা চেতনা ক্রিয়াকর্ম জীবনধারার পরিবর্তন না ঘটে।'[১৪২]

'তৃতীয় থিয়েটার' বা 'থার্ড থিয়েটার' শব্দবন্ধের 'তৃতীয়' বা 'থার্ড' শব্দটির মধ্যে ধরা পড়ে প্রথম ও দ্বিতীয় থিয়েটারের অস্তিত্ব। শহরে, বিশেষ করে মেট্রোপলিটন শহরে (কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লী ইত্যাদি) এক ধরনের থিয়েটার বর্তমান। যা আমরা বিদেশ থেকে

আমদানি করেছি ঔপনিবেশিক যুগের প্রথম পর্যায়ে। যার জন্য প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট হল, যেখানে দর্শক ও অভিনেতার জন্য নির্দিষ্ট পৃথক পৃথক জায়গা থাকে। অভিনয় হয় আলোর মধ্যে স্টেজের উপরে। যার তিনদিক বন্ধ, একদিক খোলা। অভিনেতাদের প্রবেশ করার জন্য থাকে উইংস। খোলা অংশের সামনে দর্শক অন্ধকারে বসে থেকে স্টেজে অভিনেতাদের অভিনয় উপভোগ করে। এটির টেকনিক্যাল নাম 'প্রসেনিয়াম থিয়েটার'। বাদল সরকার এটিকে সেকেন্ড থিয়েটার বলে চিহ্নিত করেছেন।[১৪৩]

আর প্রথম থিয়েটার আমাদের দেশে গ্রামীণ সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা আবহমানকাল ধরে চলে আসা লোকনাট্যের বিভিন্ন ধারা। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে যা পরিচিত- যাত্রা, তামাশা, নটাংকি, ভাওয়াইয়া, কথাকলি, রামলীলা ইত্যাদি। খোলা মাঠে, মন্দিরের প্রাঙ্গণে বা অন্য কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় বিপুল সংখ্যক দর্শকের মধ্যে, কখনো ছোটখাট স্টেজ তৈরি করে, কখনো বা মাটিতে। এখানে দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে দূরত্ব প্রসেনিয়াম থিয়েটার তুলনায় অনেক কম। থার্ড থিয়েটার আসলে এই দুই থিয়েটারের সংমিশ্রণে গঠিত বিকল্প এক থিয়েটার। নাটককারের ভাষায়-

> 'In such a situation, whether we want to revitalise the city theatre or the village theatre...and attempt to create a link between the two through a Third Theatre- a theatre of synthesis.'[১৪৪]

তৃতীয় থিয়েটারে গঠনগত দিকের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মর্মগত দিক। এই দুই থিয়েটারের কিছু গ্রহণ এবং কিছু বর্জনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অভিপ্রায়ে তৃতীয় থিয়েটারের নির্মাণ। এই 'থিয়েটার একটা দর্শন, একটা দৃষ্টিভঙ্গি, একটা ভাবধারা... মাঠে-ঘাটে পরীক্ষিত যুগের ও সমাজের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা এক বিস্তীর্ণ আন্দোলন এই বিকল্প থিয়েটারের ভিত্তি।'[১৪৫] প্রধানত রাজনৈতিক দর্শনই এর মূল কথা। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উন্নতির ফাঁকগুলিকে চিহ্নিত করে তার নাট্যরূপ ঘটানো এবং দর্শকের সামনে উপস্থাপনার মাধ্যমে চেতনা সঞ্চার করাই এই বিকল্প থিয়েটারের উদ্দেশ্য।

থিয়েটার অন্যান্য কলা মাধ্যমের (সিনেমা, গান, কবিতা, গল্প-উপন্যাস, চিত্র ও ভাস্কর্য ইত্যাদি) থেকে অনেক বেশি প্রভাবশালী। কারণ অন্যান্য মাধ্যমে লেখক বা নির্মাতা পাঠকের কাছে উপস্থিত থাকে না, থাকে তার নির্মাণ বা সৃষ্টি। কিন্তু থিয়েটার হল, 'a

live person communicates directly to another live person'।[১৪৬] শহরের থিয়েটার ব্যয়বহুল এবং তা খুব বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে না। মূলত শহুরে মধ্যবিত্ত সভ্য ব্যক্তিবৃন্দরাই দেখে থাকে। কিন্তু তাতে (বিশেষ করে গ্রুপ থিয়েটারের পরিচালিত নাটক গুলিতে) বর্তমান সমস্যার কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যদি সেগুলি শহরের বাইরে বিস্তীর্ণ গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তাহলে সমাজের মধ্যে চেতনা আনা যেতে পারে। কিন্তু অত্যধিক খরচ, জিনিসপত্রের আড়ম্বরে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। অপরদিকে গ্রামের থিয়েটারে সেইসব মানুষ গুলি উপস্থিত হয় দর্শক হিসেবে যাদের মধ্যে বেশিরভাগই শ্রমজীবী। যারা শোষিত হচ্ছে বহুকাল থেকেই, কিন্তু সে সম্পর্কে তারা সচেতন নয়। যাত্রার মাধ্যমে তাদের সচেতন করা কিছুটা সম্ভব হত; কিন্তু সে যাত্রার কাহিনি পশ্চাদবর্তী। সেখানে পাপ-পূণ্য, ভাগ্য, বিধির বিধান, সতীত্ব-অসতীত্ব ইত্যাদি বেশি থাকে। কিন্তু এই থিয়েটারের ব্যয় অনেক কম। এই দু'ধরনের থিয়েটার থেকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমেই বাদল সরকার তৈরি করতে চেয়েছিলেন 'theatre of synthesis'। তবে প্রথমে 'বর্জন' নয়। আগে 'গ্রহণ', পরে 'বর্জন'। যেগুলি বর্জিত হবে সেগুলি বর্জনীয় বলেই হবে। এখানে 'গ্রহণ' করা হবে একটি 'তথ্য'। সেটি হল জীবন্ত কলামাধ্যম। জীবন্ত অভিনেতা ছাড়া যেমন নাটক হয় না, তেমনি জীবন্ত দর্শকও নাটকে সমান গুরুত্বের। সুতরাং দর্শককে দূরে অন্ধকারে নিষ্ক্রিয় না রেখে অভিনয়ে সক্রিয় করানোই উদ্দেশ্য। যদি সেজন্য দৃশ্যপট, আলোকসম্পাত, বেশভূষা ইত্যাদি বাধার সৃষ্টি করে তাহলে সেগুলি বর্জনীয়। 'বর্জন' ঘটবে তখনি।[১৪৭]

ফলে থিয়েটারের দ্বারা অধিক পরিমাণে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা যেতে পারে। বাদল সরকার তাঁর বিকল্প থিয়েটারে শহুরে থিয়েটারের যুক্তিময়তা ও সমাজ বিশ্লেষণের অংশটুকু নিলেন এবং নিলেন গ্রামীণ থিয়েটারের গঠন প্রক্রিয়াকে। তৈরি করলেন ফ্লেক্সিবল বা নমনীয়, পোর্টেবল বা বহনীয়, ইনেক্সপেন্সিভ বা সুলভ নাট্যরীতি। দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে যতটা সম্ভব দূরত্ব ঘুচিয়ে থিয়েটারকে নিয়ে গেলেন রিচুয়াল এর কাছাকাছি। তৃতীয় থিয়েটার হয়ে উঠল রিচুয়ালের মতোই 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ক্রিয়া' এবং অভিনেতাও দর্শককে যৌথ অংশগ্রহণ এর একটি স্থান।

তথ্যসূত্র :

১. Boal, Augusto; *'Theatre of the Oppressed'*, Pluto Press, London, 2008, Page-1

২. প্লেটো; *রিপাবলিক*, সরদার ফজলুল করিম (অনু.), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪, পৃ-৪৬৯

৩. চক্রবর্তী, রথীন; *পিপলস থিয়েটার : গণনাট্য আন্দোলনের ইস্তাহার*, রম্যাঁ রলাঁ, পিপলস থিয়েটার, রথীন চক্রবর্তী (অনু. ও সম্পা.), নাট্যচিন্তা, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ-৭

৪. রলাঁ, রম্যাঁ; *পিপলস থিয়েটার*, রথীন চক্রবর্তী (অনু. ও সম্পা.), নাট্যচিন্তা, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ-১১৩

৫. তদেব, পৃ-১২৪

৬. তদেব, পৃ-১১১৮

৭. তদেব, পৃ-১১১৬

৮. তদেব, পৃ-১১১৭

৯. তদেব, পৃ-১১১৭

১০. তদেব, পৃ-১১১৯

১১. তদেব, পৃ-১৯২

১২. তদেব, পৃ-১৯৪

১৩. Lenin, V. I.; *Party Organisation and Party Literature*, Andrew Rothstein (Translated and Edited), Collect Works, Volume-10, Progressive Publishers, Moscow, 1978, Page-45,

১৪. তদেব, পৃ-49

১৫. সেতুঙ, মাও; *সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়েনানের আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ*, নির্বাচিত রচনা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৫, পৃ-২৬৩

১৬. তদেব, পৃ-২৬৩

১৭. তদেব, পৃ-২৬৫

১৮. তদেব, পৃ-২৬৬

১৯. তদেব, পৃ-২৬৭

২০. তদেব, পৃ-২৭১

২১. তদেব, পৃ-২৭৭-২৭৮

২২. Piscator, Erwin; *The Political Theatre*, Avon Publishers of Bird, 1978, Page-12

২৩. তদেব, পৃ-15

২৪. তদেব, পৃ-16

২৫. তদেব, পৃ-17

২৬. তদেব, পৃ-23

২৭. তদেব, পৃ-42

২৮. তদেব, পৃ-45

২৯. তদেব, পৃ-45

৩০. তদেব, পৃ-45

৩১. তদেব, পৃ-45

৩২. Brecht, Bertolt; *A Short Organum for The Theatre*, Jhon Willett (edited and translated), Brecht on Theatre: The Development of

an Aesthetic, Radha Krishna Prakashan, New Delhi, Reprint 1978, Page-181

৩৩. তদেব, পৃ-183

৩৪. তদেব, পৃ-185

৩৫. তদেব, পৃ-186

৩৬. তদেব, পৃ-190

৩৭. তদেব, পৃ-193

৩৮. তদেব, পৃ-193

৩৯. তদেব, পৃ-194

৪০. তদেব, পৃ-196

৪১. তদেব, পৃ-196-197

৪২. তদেব, পৃ-198

৪৩. তদেব, পৃ-200

৪৪. বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ; *যাত্রা,* অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, জুলাই ১৯৯০, পৃ-৫৩৩

৪৫. সেন, সুকুমার; *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২৫, পৃ-৯১

৪৬. দাস, পুলিন; *বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক,* এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪২৫, পৃ-২৪

৪৭. তদেব, পৃ-২৯

৪৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ; *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ-১৯

৪৯. Dobson Collet, Sophia (Editor); *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, Calcutta, 1914, Page-124

৫০. চন্দ্র, বিপন প্রমুখ; *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭*, সুনীল মুখোপাধ্যায় (অনু.), কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০২১, পৃ-৫৯

৫১. সেনগুপ্ত, প্রমোদ; *নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ-১৪-১৫

৫২. অধিকারী, প্রবোধবন্ধু; *নাটক ও রাজনীতি*, পি সরকার, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ-২০০

৫৩. মিত্র, দীনবন্ধু; *নীল-দর্পণ*, দীনবন্ধু রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জুলাই ১৯৮৯, পৃ-১

৫৪. বাগল, যোগেশচন্দ্র; *জাতীয়তার নবমন্ত্র ও হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত*, শ্রীগৌরচন্দ্র পাল কর্তৃক নিউ মহামায়া প্রেস, কলকাতা, ১৩৫২, পৃ-২৪

৫৫. ভট্টাচার্য, আশুতোষ বাংলা; *নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, বইমেলা ২০০২, পৃ-৫৪৫

৫৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ; *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৯

৫৭. দাস, উপেন্দ্রনাথ; *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী*, জি. পি. রায় এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১২৮৭, পৃ- 'বিজ্ঞাপণ' অংশ

৫৮. ভট্টাচার্য, শঙ্কর; *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান ১৮৭২-১৯০০*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, মার্চ ২০১৩, পৃ-১২২

৫৯. তদেব, পৃ-১২৪

৬০. দাস, পুলিন; *বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৯১

৬১. তদেব, পৃ-১২৬

৬২. দাস, পুলিন; *বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৯৩

৬৩. তদেব, পৃ-১৯৪

৬৪. ত্রিপাঠী, অমলেশ; *ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব,* নির্মল দত্ত (অনু.), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯১, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ-১০১

৬৫. তদেব, পৃ-১০২

৬৬. চন্দ্র, বিপন প্রমুখ; *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭,* প্রাগুক্ত, পৃ-৯৪

৬৭. তদেব, পৃ-৯৫

৬৮. ভট্টাচার্য, শঙ্কর; *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান ১৮৭২-১৯০০,* প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫

৬৯. গোস্বামী, প্রভাতকুমার; *দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ বৈশাখ ১৩৬৭, পৃ-১৪২

৭০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর; *পলাশি থেকে পার্টিশন ও তারপর,* কৃষ্ণেন্দু রায় (অনু.), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৮, পৃ-৩৪০

৭১. চন্দ্র, বিপন প্রমুখ; *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭,* প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৫

৭২. তদেব, পৃ-১৩৯

৭৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর; *পলাশি থেকে পার্টিশন ও তারপর,* পৃ-৩৫৪

৭৪. তদেব, পৃ-৩৬১

৭৫. তদেব, পৃ-৩৭০

৭৬. রায়, মন্মথ; *বাঙলার সাধারণ মঞ্চ ও আমি,* নাট্যগ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, মনমথন প্রকাশন, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ১৯৫১, পৃ-৪৬৪

৭৭. তদেব, পৃ-৪৬৫

৭৮. তদেব, পৃ-৪৬৬

৭৯. সেনগুপ্ত, শচীন; *বাংলার নাটক ও নাট্যশালা*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৬৪, পৃ-৩৫-৩৬

৮০. দাশ, ধনঞ্জয় (সম্পা.); *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক*, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলকাতা, জুন ১৯৬০, পৃ-সাত

৮১. ক. Anand, M R; *On the Progressive Writer's Movement*, Sudhi Pradhan (Edited), Marxist Cultural Movement in India, Volume-1, National Book Agency PVT. LTD, Kolkata, 2017, Page-38

খ. মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ; *চরৈবেতি, চরৈবেতি*, নীতীশ বিশ্বাস (সম্পা.), ভারতের প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলন (১৯৩৬-২০২১), ঐকতান গবেষণা সংসদ, কলকাতা, ২০২২, পৃ-১৬০

৮২. গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.); *প্রগতি*, প্রগতি লেখক সংঘ, কলকাতা, ১৩৪৪, পরিশিষ্ট-ক

৮৩. Prem Chand, Munshi; *The Nature and Purpose of Literature*, Sudhi Pradhan (Edited), Marxist Cultural Movement in India, Volume-1, National Book Agency PVT. LTD, Kolkata, 2017, Page-81

৮৪. সেহানবীশ, চিন্মোহন; *৪৬ নং—একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে*, সেরিবান, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-৫৭

৮৫. মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ; *চরৈবেতি, চরৈবেতি*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬২

৮৬. দাশ, ধনঞ্জয় (সম্পা.); *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ-তেরো

৮৭. গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.); *প্রগতি*, প্রাগুক্ত, পৃ-মুখবন্ধ

৮৮. দাশ, ধনঞ্জয় (সম্পা.); *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ-চৌদ্দ

৮৯. মজুমদার, মোহিতলাল; *বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক*, সাহিত্য-বিতান, পৃ-২২৪

৯০. মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ; *চরৈবেতি, চরৈবেতি*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬৩

৯১. দাশ, ধনঞ্জয় (সম্পা.); *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ-কুড়ি

৯২. চন্দ্র, বিপান প্রমুখ; *স্বাধীনতা সংগ্রাম*, বজ্রদুলাল চট্টোপাধ্যায় (অনু.), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি, নবম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ-১৭৯-১৮০

৯৩. বেরা, অঞ্জন; *পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর*, গণনাট্য প্রকাশনী, কলকাতা, ৮ এপ্রিল ২০১৭, পৃ-২৩

৯৪. রায়চৌধুরী, সজল; *গণনাট্য কথা*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭, পৃ-১০-১১

৯৫. দাশ, ধনঞ্জয় (সম্পা.); *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ-আঠাশ-ঊনত্রিশ

৯৬. সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর; *চল্লিশ দশকের ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন : পূর্ববঙ্গ*, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণ সান্যাল (সম্পা.), ফ্যাসিস্টবিরোধী সংকলন, পরিচয়, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০২১, পৃ-২০৬

৯৭. দাশ, ধনঞ্জয় (সম্পা.); *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ-তেত্রিশ

৯৮. বেরা, অঞ্জন; *পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৫

৯৯. তদেব, পৃ-২৪

১০০. *Fourth All-India Progressive Writers' Conference*, Sudhi Pradhan (Edited), Marxist Cultural Movement in India, Volume-1,, National Book Agency PVT. LTD, Kolkata, 2017, Page-126

১০১. *The First All India People's Theatre Conference*, Sudhi Pradhan (Edited), Marxist Cultural Movement in India, Volume-1, National Book Agency PVT. LTD, Kolkata, 2017, Page-135

১০২. প্রধান, সুধী; *গণনাট্য আন্দোলনের কয়েকটি অতীত প্রসঙ্গ*, গণনাট্য ৩য় বর্ষ, জুলাই ও অক্টোবর ১৯৬৭, পৃ-২২

১০৩. গ্রিনো, পল; *আধুনিক বাংলা : সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ*, সুপ্রিয় গুহ প্রমুখ (অনু.), কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১১৯৭,পৃ-৭৪

১০৪. চট্টোপাধ্যায়, কাশীনাথ (সং. ও সম্পা.); *প্রবাসী*, কার্তিক ১৩৫০, উপসি বাংলা, সাময়িক পত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর, সেরিবান, ২০১১, পৃ-৬৫-৬৬

১০৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ জানুয়ারি, ২০১১

১০৬. Sen, Amartya; *Poverty and Famines: An Essay of Entitlement and Deprivation*, Oxford University Press, 1981, page-25

১০৭. বেরা, অঞ্জন; *পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩

১০৮. রায়চৌধুরী, সজল; *গণনাট্য কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪

১০৯. বেরা, অঞ্জন; *পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৪

১১০. Nehru, Jawaharlal; *Tryst with destiny*, Rudrangshu Mukherjee (Edited), Great Speeches of Modern India, Random House, India, 2007, page-185

১১১. দাসগুপ্ত, অভিজিৎ; *বিস্থাপন ও নির্বাসন : ভারতে রাষ্ট্র-উদ্বাস্তু সম্পর্ক*, আশীষ লাহিড়ী (অনু.), কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৮, পৃ-২৫

১১২. চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার; *প্রান্তিক মানব*, দীপ প্রকাশণ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ-৯৫

১১৩. গোস্বামী, প্রভাত কুমার; *উত্তর চল্লিশের রাজনৈতিক নাটক*, সংস্কৃতি পরিষদ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮২, পৃ-৮৩

১১৪. তদেব, পৃ-৮২

১১৫. ক. বেরা, অঞ্জন; *পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ-৮০

খ. রায়চৌধুরী, সজল; *গণনাট্য কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ-৭২-৭৩

১১৬. Pradhan, Sudhi (Edited), *Marxist Cultural Movement in India,* Volume-II, National Book Agency PVT. LTD, Kolkata, 2017, Page-48-49

১১৭. গোস্বামী, প্রভাত কুমার; *উত্তর চল্লিশের রাজনৈতিক নাটক*, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৩

১১৮. দত্ত, সুনীল; *নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর*, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৫ নভেম্বর ২০১৭, পৃ-১০৭

১১৯. তদেব, পৃ-১০৮

১২০. ক. দত্ত, সুনীল; *নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ-১০৬

খ. গোস্বামী, প্রভাত কুমার; *উত্তর চল্লিশের রাজনৈতিক নাটক*, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৫

১২১. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ; *কৃষক বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রবিপ্লব*, ইতিহাসের উত্তরাধিকার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০০, পৃ-৩৭

১২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল; *ভূমি ও ভূমিসংস্কার সেকাল একাল*, দে'জ পাবলশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃ-২৩৪

১২৩. সেন, সুকোমল; *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-২০১০*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, অক্টোবর ২০১৫, পৃ-৪০১

১২৪. তদেব, পৃ-৪০২

১২৫. https://www.owlapps.net/owlapps_apps/articles?id=5068278&lang=en

১২৬. দত্ত, উৎপল; *রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ*, জপেন দা জপেন যা, গদ্য সংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ২০১৫, পৃ-২২৬

১২৭. দত্ত, উৎপল; *টুওয়ার্ডস আ রেভলিউশনারি থিয়েটার*, নীহাররঞ্জন বাগ (অনু.), নাট্যচিন্তা, কলকাতা, ২০১৩, পৃ-৪৬

১২৮. তদেব, পৃ-৪৭

১২৯. দত্ত, উৎপল; *হোয়াট ইজ টু বি ডান*, প্রতাপ সি. ঘোষ (অনু. ও সম্পা.), নাট্যচিন্তা, কলকাতা, ২০১০, পৃ-২৯

১৩০. দত্ত, উৎপল; *টুওয়ার্ডস আ রেভলিউশনারি থিয়েটার,* প্রাগুক্ত, পৃ-৭১

১৩১. দত্ত, উৎপল; *রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩০

১৩২. দত্ত, উৎপল; *হোয়াট ইজ টু বি ডান*, প্রাগুক্ত-৩০

১৩৩. দত্ত, উৎপল; *রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩১

১৩৪. দত্ত, উৎপল; *টুওয়ার্ডস আ রেভলিউশনারি থিয়েটার,* প্রাগুক্ত, পৃ-৭৭

১৩৫. দত্ত, উৎপল; *হোয়াট ইজ টু বি ডান*, প্রাগুক্ত-১৪

১৩৬. দত্ত, উৎপল; *টুওয়ার্ডস আ রেভলিউশনারি থিয়েটার,* প্রাগুক্ত, পৃ-৭৭

১৩৭. তদেব, পৃ-৭৯

১৩৮. তদেব, পৃ-৫১

১৩৯. দত্ত, উৎপল; *রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩১

১৪০. দত্ত, উৎপল; *হোয়াট ইজ টু বি ডান*, প্রাগুক্ত-৬৩

১৪১. দত্ত, উৎপল; *টুওয়ার্ডস আ রেভলিউশনারি থিয়েটার,*, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৬

১৪২. সরকার, বাদল; *থিয়েটারের ভাষা*, রক্তকরবী প্রকাশন, কলকাতা, ২০০২, পৃ-২৯

১৪৩. তদেব, পৃ-১০

১৪৪. Sircar, Badal; *The Third Theatre*, Badal Sircar, Kolkata, 1978, Page-3

১৪৫. সরকার, বাদল; *থিয়েটারের ভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮

১৪৬. Sircar, Badal; *The Third Theatre*, প্রাগুক্ত, p-7

১৪৭. সরকার, বাদল; *থিয়েটারের ভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৫